কোথা আনন্দময় ! কোথা দয়াময় ! কোথা দুঃখীর দুঃখ-হরণ ! আমি তোমার নিকট আসিয়াছি। কোথায় আনন্দের স্পর্শমণি ! আমার এ কঠিন এ মলিন এ সন্তপ্ত হৃদয়কে স্পর্শ কর। আমি তোমার অতুল্য প্রেমানন দর্শন করিয়া চির সুখে সুখী হই। এই আমার কামনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অদ্বৈত মতের সমালোচনা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তাহার পরে পঞ্চদশী বলিতেছেন

"ত্রিতয়ীমপি তাং মুক্ত্বা পরস্পরবিরোধিনীং
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং মহাবাক্যেন লক্ষ্যতে ॥"

পরস্পর-বিরোধিনী এই ত্রিধারূপিণী মায়া পরিত্যাগ করিয়া (অর্থাৎ সত্বগুণ-প্রধানা মায়া যাহা পরিগ্রহ করিয়া ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ, তমোগুণপ্রধানা মায়া যাহা পরিগ্রহ করিয়া ঈশ্বর জগতের উপাদান কারণ এবং রজোগুণপ্রধানা মায়া যাহা পরিগ্রহ করিয়া জীব অবিদ্যার বশীভূত, এই ত্রিধারূপিণী মায়া পরিত্যাগ করিয়া) এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম তত্ত্বমসি বাক্য দ্বারা লক্ষিত হ'ন। ইহার পরের শ্লোকে পঞ্চদশী আপনার চরম মন্তব্য কথাটি যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি; তাহা এই যে,

"সোঽয়ং ইত্যাদি বাক্যেষু বিরোধাত্তদিদন্তয়োঃ।
ত্যাগেন ভাগয়োরেক আশ্রয়ো লক্ষ্যতে যথা ॥
মায়াবিদ্যে বিহায়ৈবমুপাধী পরজীবয়োঃ।
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং মহাবাক্যেন লক্ষ্যতে ॥"

"সেই এই কালিদাস" এই বাক্য হইতে সেই এবং এই ছাড়িয়া দিয়া যেমন সেই-এই-বর্জ্জিত কেবলমাত্র কালিদাসকে লক্ষ্য করা হয়, তেমনি ঈশ্বর এবং জীবের মধ্যবর্ত্তী ঐশীশক্তির প্রভাব যাহা এ-পারে জীবের অবিদ্যারূপে প্রাদুর্ভূত হয় এবং ও-পারে ঈশ্বরের মায়া-রূপে প্রকটিত হয়, তাহা ছাড়িয়া দিয়া এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম তত্ত্বমসি বাক্য দ্বারা লক্ষিত হ'ন। এই গেল অদ্বৈতবাদীর মতানুযায়ী জীব-ব্রহ্মের ঐক্য। এখন যোগশাস্ত্রের প্রণেতা পাতঞ্জল জীবেশ্বরের সম্বন্ধ বিষয়ে কিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দেখা যা'ক্।

পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্রে ঈশ্বর-বিষয়ে দিব্য একটি সূত্র বিন্যস্ত আছে; তাহা এই;—

"তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজং"

ইহার অর্থ এই যে, ঈশ্বরেতে সর্ব ত্বের বীজ পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত। "ঈশ্বর র্ব্বজ্ঞ" এই কথা বলিলেই হইত, তাহা বলিয়া "ঈশ্বরেতে সর্ব্বজ্ঞত্বের বীজ প কাষ্ঠা প্রাপ্ত" এরূপ ঘুরাইয়া বলিবার তাৎপর্য্য কি? বিশেষ একটু তাৎপর্য্য আছে;—তাহা এই যে, জীবেতে সর্ব্বজ্ঞত্ব বীজ-ভাবে অবস্থিতি করিতেছে—ঈশ্বরেতে সর্ব্বজ্ঞত্ব পরাকাষ্ঠা বিকসিত রহিয়াছে। "জীবেতে সর্ব্বজ্ঞত্ব বীজভাবে অবস্থিতি করিতেছে" ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে, জীব যদিচ সর্ব্বজ্ঞ নহে, তথাপি তাহার জ্ঞান সাধন-দ্বারা ক্রমে ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বজ্ঞত্বের নিকটবর্ত্তী হইতে পারে। জীবে সর্ব্বজ্ঞত্বের বীজ রহিয়াছে কিন্তু সে বীজের সম্যক্ বিকাশ নাই বলিয়া জীব সর্ব্বজ্ঞ নহে। ঈশ্বরেতে সর্ব্বজ্ঞত্বের বীজ পরিপূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত বলিয়া তিনিই কেবল সর্ব্বজ্ঞ। টীকাকার ভোজরাজ ঐ সূত্রের

যেরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এই ;—

"দৃষ্টা হি অণুত্বমহত্ত্বাদীনাং ধর্ম্মানাং সাতিশয়ানাং কাষ্ঠাপ্রাপ্তিঃ" অণুত্ব মহত্ব প্রভৃতি (অর্থাৎ ছোটত্ব বড়ত্ব প্রভৃতি) যে কোনো ধর্ম্মের ন্যূনাধিক্য সম্ভবে তাহারই পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্তি কোথাও না কোথাও দেখা যায় ; কিরূপ ? না "যথা পরমাণৌ অণুত্বস্য আকাশে চ পরমমহত্ত্বস্য" যেমন পরমাণুতে অণুত্বের পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্তি এবং আকাশে মহত্ত্বের পরাকষ্ঠা-প্রাপ্তি। "এবং জ্ঞানাদয়োঽপি চিত্তধর্ম্মাস্তারতম্যেন পরিদৃশ্যমানাঃ ক্বচিন্নিরতিশয়তামাপাদয়ন্তি— যত্র চৈতে নিরতিশয়াঃ স ঈশ্বরঃ।" এইরূপ [জ্ঞা]নাদি চিত্তধর্ম্ম যাহা কোথাও বা অল্প [পরি]মাণে, কোথাও বা অধিক পরিমাণে [দৃষ্ট] হয়, তাহা অবশ্য কোথাও না কো[থা]ও পরাকাষ্ঠা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে— [যাঁ]হাতে জ্ঞানাদি ধর্ম্ম পরাকাষ্ঠা পূর্ণতা-প্রাপ্ত তিনিই ঈশ্বর।" ঈশ্বরেতে সর্ব্বজ্ঞত্বের বীজ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত" ইহার অর্থ এখন বুঝা গেল ; তাহা এই যে, ঈশ্বরেতে যে জ্ঞান পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান—জীবেতে সেই জ্ঞান বীজভাবে অবস্থিতি করিতেছে। পাতঞ্জলের এই সিদ্ধান্তটির উপরে যদি পঞ্চদশীর প্রদর্শিত ভাগত্যাগ-লক্ষণা (কিনা বিবেকপদ্ধতি (analysis) প্রয়োগ করা যায় ; অর্থাৎ জীব-জ্ঞানের বীজ ভাব এবং ঐশ্বরিক জ্ঞানের পরিপূর্ণ বিকাশ-ভাব, এ দুই কথার উল্লেখ না করিয়া যদি "উভয়েরই জ্ঞান আছে" এই বৃত্তান্তটির প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করা যায়, তবে তাহা হইলেই দাঁড়ায় যে, জ্ঞানের সত্তামাত্র জীবেশ্বরের ঐক্য-স্থান। পঞ্চদশী মূল সত্যের অন্বেষণে বাহির হইয়া সম্বিৎ হইতে যাত্রারম্ভ করিয়াছেন ইহাতে তাঁহার খুবই বিচক্ষণতা প্রকাশ পাইয়াছে ; কেননা জ্ঞাত সত্য হইতে অজ্ঞাত সত্যের দিকে অগ্রসর হওয়াই সত্যান্বেষণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী। কিন্তু তিনি কেবল-মাত্র বিবেক-পদ্ধতি (ইংরাজি ভাষায় যাহাকে বলে process of analysis কেবল-মাত্র সেই বিবেক-পদ্ধতি) অবলম্বন করিয়া চলাতে সম্বিতের নির্গুণ একত্বে (analytic unityতে) আটক পড়িয়া আরম্ভ-স্থান হইতে এক পদও অগ্রসর হইতে পারেন নাই। কাণ্টের প্রদর্শিত analytic judgement এবং synthetic judgment দুয়ের প্রভেদ যাঁহারা অবগত আছেন তাঁহারা বলিবা-মাত্রই বুঝিতে পারিবেন যে, বিবেক পদ্ধতি অনুসারে, analysis পদ্ধতি অনুসারে, জ্ঞানে যাহা পূর্ব্ব হইতে আছে তাহাকেই কেবল মার্জ্জিত করা যাইতে পারে কিন্তু জ্ঞান-পথে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে না, জ্ঞানের আয়বৃদ্ধি করা যাইতে পারে না। পঞ্চদশী বিবেক-পদ্ধতির জলাশয়ে সম্বিৎকে স্নান করাইয়া তাহার গাত্র-হইতে ঐশী শক্তির প্রভাব মার্জ্জন করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছেন ;—এটা তিনি দেখেন নাই যে, সম্বিতের গাত্র হইতে অবিদ্যা মার্জ্জন করা যেমন আবশ্যক, বিদ্যা দ্বারা সম্বিতের পুষ্টি সাধন করাও তেমনি আবশ্যক। সম্বিৎকে যেমন স্নান করানো আবশ্যক, তেমনি তাহাকে আহার দান করাও আবশ্যক। মনকে এরূপ প্রবোধ দিলে চলিবে না যে, অবিদ্যা ঝাড়িয়া ফেলার নামই বিদ্যা উপার্জ্জন করা ; কেননা ইহা সকলেরই জানা কথা যে, মরীচিকায় জল-ভ্রম ঘুচিয়া গেলেও—অবিদ্যা ঘুচিয়া গেলেও— মরীচিকা-সম্বন্ধে বিদ্যা-উপার্জ্জনের অনেক অবশিষ্ট থাকে। মরীচিকা দেখিলেই পথিকের জল-ভ্রম হয় ; কিন্তু সে যখন

দৃশ্যমান জলাশয়ের নিকটে অগ্রসর হইয়া দেখে যে, কোথাও জলের নাম-গন্ধও নাই, তখন তাহার সে ভ্রম ঘুচিয়া যায়—অবিদ্যা ঘুচিয়া যায় ; অবিদ্যা ঘুচিয়া গেলেও—মরীচিকা-বিষয়ে তাহার বিদ্যার কিছু মাত্র আয়-বৃদ্ধি হয় না। সে কেবল এইটুকু মাত্র জানিয়াই নিশ্চিন্ত যে, মরীচিকা জল নহে ; তা বই—মরীচিকা যে, পদার্থটা কি, তাহা তাহার স্বপ্নের অগোচর। দৃশ্যমান জগৎ আমাদের চক্ষে যেরূপ প্রতিভাত হইতেছে তাহা তাহার স্বরূপগত ভাব নহে ইহা জানিতে পারা'র নামই অবিদ্যা ঘুচিয়া যাওয়া—ভ্রম ঘুচিয়া যাওয়া। আর সেই দৃশ্যমান জগতের অভ্যন্তরে ঐশীশক্তি কিরূপে কার্য্য করিতেছে তাহা জানিতে পারা'র নামই বিদ্যা। তাই আমরা বলি যে, সম্বিৎ হইতে পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যা ঝাড়িয়া ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে শেষোক্ত বিদ্যা দ্বারা তাহার পুষ্টি সাধন করা আবশ্যক। Maxmuller কৃত Knat দর্শনের অনুবাদের উপক্রমণিকার একস্থানে এইরূপ লিখিত আছে ;—

This is from one point of view the great truth of idealism, that the source of all direct knowledge is to be found in consciousness but from another latet anguis in herba (শেষের ভাগটা latin উহার অর্থ—Snake lies hidden in the herbs) অর্থাৎ বাহিরে দেখিতে ভাল কিন্তু ভিতরে মার প্যাঁচ রহিয়াছে ;—সে মার প্যাঁচ কিরূপ তাহা তাহার পরেই প্রশ্নচ্ছলে ইঙ্গিত করা হইতেছে :—

Are our thoughts really so much in our power ? or are we not rather in relation to them, conditioned and overruled by countless influences which have their source in the thought of our contemporaries and still more in that of antiquity ? পাতঞ্জল বলিতেছেন and above all in that of ঈশ্বর ? তিনি বলিতেছেন যে,

"স এষ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ" ঈশ্বর পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যদিগেরও গুরু যেহেতু তিনি কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন। পঞ্চদশী বলিতেছেন যে, সম্বিৎ হইতে অবিদ্যা ধৌত করিয়া ফেলিতে হইবে ; পাতঞ্জল বলিতেছেন যে, তদ্ব্যতীত সম্বিৎকে বিদ্যা-দ্বারা পরিপুষ্ট করিতে হইবে ; এবং তাহার প্রকৃষ্ট উপায় ঈশ্বর-প্রণিধান। টীকাকার ভোজরাজ "ঈশ্বর প্রণিধান" কথাটির তাৎপর্য্য যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এই ;—ঈশ্বর-প্রণিধা কি ? না "তত্র ভক্তিবিশেষঃ" ঈশ্বরে বিশিষ্টরূপ ভক্তি। "বিশিষ্টমুপাস বিশিষ্টরূপ উপাসনা "সর্ব্বক্রিয়াণা তত্রার্পণং" তাঁহাতে সমস্ত কর্ম্মের সমপ "বিষয়-সুখাদিকং ফলমনিচ্ছন্ সর্ব্বাঃক্রি তস্মিন্ পরমগুরৌ অর্পয়তি" বিষয়-সুখা ফল ইচ্ছা না করিয়া সমস্ত কর্ম্ম সেই পরম গুরুর প্রতি নিবেদন করিয়া দেওয়া" "তৎপ্রণিধানং" ইহারই নাম প্রণিধান। পঞ্চদশী ঐশীশক্তি প্রভাবকে মিথ্যা মায়া-বোধে সম্বিৎ হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে বলেন ; পাতঞ্জল তাহা বলেন না ;—পাতঞ্জল পরম গুরু পরমেশ্বরের মঙ্গলময়ী শক্তির প্রভাবে পরিগঠিত হইয়া আত্ম-শক্তি উপার্জ্জন করিতে বলেন—প্রকৃতির উপরে কর্ত্তৃত্ব উপার্জ্জন করিতে বলেন। সাংখ্য-মত এবং অদ্বৈত মতের মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই স্থানটিতে। অদ্বৈত-বাদী প্রকৃতি হইতে চক্ষু ফিরাইয়া প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্তি-লাভ করিবার পরামর্শ দে'ন। সাংখ্য বলেন যে, প্রকৃতির অধীনতা হইতে যদি মুক্তি পাইতে ইচ্ছা কর তবে প্রকৃ-

তিকে তন্ন তন্ন করিয়া জ্ঞানে আয়ত্ত কর। বাহিরের দুর্দান্ত প্রকৃতি ঊনবিংশ শতাব্দীর এত পোষ মানিল কিসে? ঊনবিংশ শতাব্দী সাংখ্যের ঐ বচনটি শিরোধার্য্য করাতে! ঊনবিংশ শতাব্দী যদি সেশ্বর-সাংখ্য পাতঞ্জলের বচন শিরোধার্য্য করিয়া পরমগুরু পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করিত, তবে অন্তরের প্রকৃতিও ঐরূপই তাহার পোষ মানিত। সেশ্বর-সাংখ্য পাতঞ্জল বলেন যে,ঈশ্বর পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যদিগেরও গুরু; তিনি আবহমান কাল মনুষ্যমণ্ডলীকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন বলিয়া তাহারই গুণে মনুষ্য জ্ঞানী হইয়াছে; নহিলে, শুধু কেবল সম্বিৎ মাজা-ঘসা করিয়া কেহই বিদ্যা উপার্জ্জনেও সমর্থ হয় না—প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্তিলাভেও সমর্থ হয় না। পঞ্চদশীর গ্রন্থকারকে যদি তাঁহার দশ বৎসর বয়সে হিংস্র-জন্তুরহিত, নানা সুখাদ্য ফল-বৃক্ষ-শোভিত, একটি জনশূন্য উপদ্বীপে ছাড়িয়া দেওয়া যাইত, তাহা হইলে তাঁহার সম্বিৎ এখনো যাহা তখনও তাহাই থাকিত কিন্তু তাহা হইলে তিনি পঞ্চদশী প্রণয়ন করিতে পারিতেন না। তাহা হইলে তাঁহার সম্বিৎ সম্বিৎ-মাত্রই থাকিয়া যাইত—জীবেশ্বরের ঐক্যস্থান মাত্রই থাকিয়া যাইত, তথা হইতে তিনি একপদও জ্ঞান-পথে অগ্রসর হইতে পারিতেন না। অতএব সম্বিৎকে যেমন মাজিয়া ঘসিয়া অবিদ্যা হইতে নির্মুক্ত করা আবশ্যক—তেমনি তাহাকে ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠিত জনসমাজের সাধুসঙ্গের প্রভাব দ্বারা, ঈশ্বরানুগৃহীত পুরাতন আচার্য্যদিগের উপদেশ দ্বারা এবং ঈশ্বরের উপাসনা-লব্ধ প্রসাদ-সম্বল দ্বারা পরিপুষ্ট করা আবশ্যক। জ্ঞানের পরিশোধন যেমন আবশ্যক—পরিবর্দ্ধনও তেমনি আবশ্যক। শাস্ত্রের মতামত সংক্ষেপে বলিলাম; এমন তৎ তৎ বিষয়ে আমার বুদ্ধিতে আমি যাহা বুঝি তাহা দ্রুতগতি বলিয়া প্রস্তাব সাঙ্গ করি। কেন না, আমার কাণের কাছে আমার সম্বিৎ ক্রমাগত ফুসলাইতেছে

"গতা বহুতরা ভ্রাতঃ স্বল্পা তিষ্ঠতি শর্ব্বরী।"

জীবেশ্বরের মধ্যে পাতঞ্জলের প্রদর্শিত গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ হইতে যাত্রারম্ভ করাই আমি শ্রেয় বিবেচনা করিতেছি। গুরু যখন শিষ্যকে জ্ঞানোপদেশ করেন, তখন তিনি দেয়ালকে জ্ঞানোপদেশ করেন না—আপনারই মতন একজন জ্ঞানবান্ মনুষ্যকে জ্ঞানোপদেশ করেন। মনে কর যেন রসায়ন-বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য শিষ্য গুরুর নিকটে গমন করিলেন। এমন অনেক বিষয় আছে যাহা গুরুও যেমন জানেন শিষ্যও তেমনি জানেন। গুরু এবং শিষ্য উভয়েই জানেন যে, জল তরল পদার্থ। এই গোড়ার বিষয়টিতে গুরু এবং শিষ্য উভয়েরই জ্ঞানের ঐক্য রহিয়াছে। কিন্তু এই গোড়ার ঐক্য স্বতন্ত্র, আর, শেষের ঐক্য স্বতন্ত্র। গোড়ার ঐক্য শিষ্যের যাত্রারম্ভস্থান—শেষের ঐক্য শিষ্যের গম্য স্থান। জলের মূল উপাদান সম্বন্ধীয় সমস্ত তত্ত্ব গুরু যেরূপ জানিতেছেন, শিষ্য যখন তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া সেইরূপ জানিবেন, তখন গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে ইতিপূর্ব্বোক্ত গোড়ার ঐক্য ব্যতীত নূতনতর আর এক প্রকার ঐক্য আবির্ভূত হইবে। ইহাকেই আমি বলিতেছি শেষের ঐক্য। জল তরল পদার্থ এ বিষয়ে গুরুশিষ্যের জ্ঞানের ঐক্য পূর্ব্ব-হইতেই আছে; কিন্তু জলের মূল উপাদান অম্লজন এবং উদজন বায়ু; সেই দুই বায়ু উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া তাহার মধ্যে তাড়িত সঞ্চার করিলে জল উৎপন্ন হয়;

ইত্যাদি নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-বিষয়ে গুরুশিষ্যের জ্ঞানের ঐক্য পূর্ব্বে ছিল না—শিক্ষার পরিচালনা-দ্বারা তাহা নূতন আবির্ভূত হইল। এই শেষের ঐক্যই সাধনের বিষয়। গোড়ার ঐক্য সাধনের পূর্ব্ব হইতেই আছে। গোড়ার ঐক্য হইতে সাধক যাত্রারম্ভ করেন, এবং সাধন-দ্বারা শেষের ঐক্যে উপনীত হ'ন। যদি গুরুকে বলা যায় যে, তুমি তোমার বেশী জ্ঞান ছাড়িয়া দেও, আর, শিষ্যকে বলা যায় যে, তুমি তোমার বেশী জানিবার ইচ্ছা ছাড়িয়া দেও; আর, সেইরূপ রফার প্রস্তাবে যদি উভয়েই সম্মত হ'ন; তবে গোড়ার ঐক্য যাহা উভয়ের মধ্যে গোড়া হইতেই আছে, তাহাই থাকিয়া যায়—শেষের ঐক্য অনেক হাত জলের নিচে পড়িয়া যায়। গোড়া'র ঐক্যের নিজের বেশী কোনো মূল্য নাই। গোড়ার ঐক্যস্থানটির তখনই সার্থকতা হয় যখন শিষ্যের জ্ঞান সেইখান-হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া গুরুর উন্নত জ্ঞানের সহিত উত্তরোত্তর ক্রমশই ঘনিষ্ঠ ঐক্য-সূত্রে নিবদ্ধ হইতে থাকে। গুরু যদি একজন সামান্য পাঠশালার গুরু মহাশয় হ'ন, তবে শিষ্য হয় তো পাঁচ বৎসরের মধ্যেই গুরুর সমস্ত বিদ্যা আত্মসাৎ করিয়া তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত হইয়া উঠেন। পক্ষান্তরে গুরু যদি একজন দেশবিখ্যাত মহা-পণ্ডিত হ'ন, তবে শিষ্য হয় তো ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিলেও তাঁহার বিদ্যার তল আঁকড়িয়া পা'ন না। ইহাতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গুরু যেখানে অসীম মহান্ সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ, শিষ্য সেখানে কোনো নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যেই গুরুর জ্ঞান আত্মসাৎ করিয়া তাঁহার সহিত সমান হইতে পারিবেন না। মনুষ্য-মণ্ডলী ৩০।৪০ হাজার বৎসর ধরিয়া এই যে রাশি রাশি বিদ্যাধন নগর পল্লীর পুস্তকালয়ে স্তূপাকার করিয়া সাজাইয়া রখিয়াছে—তাহা সর্ব্বজ্ঞত্ব-ভাণ্ডারের এক কোণের একটি ক্ষুদ্র ধূলিকণারও যোগ্য নহে। গোড়া'র ঐক্য সমস্ত জগতের সমস্ত বস্তুর মধ্যে আছে; প্রস্তর পাষাণ এবং উদ্ভিদের মধ্যে আছে; উদ্ভিদ্ এবং জীবের মধ্যে আছে; জীবজন্তু এবং মনুষ্যের মধ্যে আছে; মনুষ্য এবং দেবতাদিগের মধ্যে আছে; দেব মনুষ্য পশু পক্ষী তরুলতা প্রস্তর পাষাণ এবং স্বয়ং ঈশ্বর—সকলেরই মধ্যে আছে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না,—কেননা সমস্ত জগৎ এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সৃষ্টি। কিন্তু মনুষ অনন্ত কাল জ্ঞানশিক্ষা করিয়া সর্ব্বজ্ঞ, এবং শক্তি উপার্জ্জন করিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ না হইলে ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের শেষে. ঐক্য সংস্থাপিত হইতে পারে না। সম্বিৎরূপী জ্ঞান-জ্যোতি জীবেশ্বরের এবং সমস্ত জ্ঞানবান্ জীবের গোড়ার ঐক্য-স্থান ইহা আমি পঞ্চদশী গ্রন্থকারের সহিত একবাক্যে স্বীকার করিতেছি; কিন্তু তাহার সঙ্গে আমি এই আর একটি কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না যে, সেই গোড়ার ঐক্যস্থান হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া ঈশ্বরের মহান্ গম্ভীর জ্ঞান প্রেম এবং ইচ্ছার সহিত আমাদের জ্ঞান প্রেম এবং ইচ্ছার ঐক্য ক্রমশই ঘনীভূত করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে সহযাত্রীদিগের সহিত ঐক্য ঘনীভূত করিতে হইবে। আমাকে যদি আপনারা জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি দ্বৈতবাদী কি অদ্বৈতবাদী, তবে তাহার উত্তরে আমি এই বলিব যে, প্রথমতঃ জীবেশ্বরের মধ্যে গোড়ার ঐক্য সর্ব্বাবস্থাতেই অটল রহিয়াছে এবং অটল

থাকিবে—এ বিষয়ে আমি অদ্বৈতবাদী। দ্বিতীয়তঃ জীবেশ্বরের মধ্যে শেষের ঐক্য কস্মিন্‌কালেও ছিল না—এখনও নাই—এবং ভবিষ্যতেও সংঘটনীয় নহে; কেন না কোনো জীবই সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান্ ছিল না, হয় নাই, হইবে না। এই বিষয়ে আমি দ্বৈতবাদী। তৃতীয়তঃ প্রত্যেক জ্ঞানবান্ জীবের অন্তঃকরণে ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মানন্দের বীজ যাহা নিহিত আছে, তাহাই জীবেশ্বরের গোড়া'র ঐক্যস্থান;—ঈশ্বরোপাসনারূপ ক্ষেত্রকর্ষণে এবং ঈশ্বরের প্রসাদ-রূপ বারি-বর্ষণে সেই বীজ উত্তরোত্তর ক্রমে বিকাশ পাইতে থাকে;—যতই বিকাশ পায়, সাধক ততই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্য—জ্ঞানে উপলব্ধি করে—প্রেমে উপভোগ করে, এবং যত্নে আত্মসাৎ করিয়া ধর্ম্মভূষণে ভূষিত হয়। এইরূপ গোড়ার ঐক্য হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া সাধক ঈশ্বরের সহিত গাঢ়-হইতে গাঢ়তর ঐক্য-বন্ধনের দিকে অগ্রসর হয়—উচ্চ হইতে উচ্চতর লোকে সমুত্থান করে—গভীর হইতে গভীরতর অন্তরে নিমগ্ন হয়। এই বিষয়ে আমি দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। ইহার উপরে যদি আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ঈশ্বর জীবকে আপনার শক্তির অভ্যন্তরে বিলীন করিয়া না রাখিয়া কি জন্য সংসারে প্রেরণ করিলেন, তবে তাহার উত্তরে আমি বলি এই যে, জীবেশ্বরের মধ্যে জ্ঞানের বিম্বপ্রতিবিম্ব এবং প্রেমের আদান প্রদানই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। জীব ঈশ্বর হইতে পৃথক্‌কৃত না হইলে কে ঈশ্বরের অনন্ত ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্য উত্তরোত্তর-ক্রমে জ্ঞানে উপলব্ধি করিবে, প্রেমে উপভোগ করিবে, এবং যত্নে উপার্জ্জন করিয়া ধর্ম্মভূষণে ভূষিত হইবে? এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ঈশ্বর সৃষ্টিকে জড়-দ্বারা একমেটে করিলেন, এবং জীবচৈতন্য-দ্বারা দোমেটে করিলেন। জীব ব্যতিরেকে অপরিসীম ব্রহ্মাণ্ড এবং তাহার শ্রীসৌন্দর্য্য থাকিলেই বা কি আর না থাকিলেই বা কি—তাহা থাকা না থাকা দুইই অবিকল সমান। অতএব অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতাদ্বৈতবাদের বাদবিতণ্ডা বাদে আমার মতের সরাংশ কি যদি অপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তবে তাহা সংক্ষেপে এইঃ—

নিত্য সত্য পরমাত্মা ব্রহ্ম অদ্বিতীয়।
জ্ঞানে দৃশ্য, প্রেমে ভোগ্য, যত্নে লভনীয়॥
তাঁহারে পূজিয়া, জীব, হৃদে করি ধ্যান,
সাধিয়া তাঁহার কার্য্য, লভয়ে কল্যাণ॥

রামাবতারের অভিব্যক্তি।

২১ শ প্রস্তাব।

যুদ্ধকাণ্ড।

হনুমান সীতাপ্রদত্ত অভিজ্ঞান লইয়া লঙ্কা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে রামচন্দ্র নিতান্ত উন্মনা হইয়া উঠিলেন। কপিরাজ সুগ্রীব তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন বীর! তুমি সর্ব্বনাশক অবসাদ পরিত্যাগ কর; সমুদ্রবক্ষে সেতুবন্ধন করিয়া যেরূপে লঙ্কা নগরীতে সুখসঞ্চার লাভ হইতে পারে তাহার উপায় অবধারণ কর। রাম স্বীকৃত হইলেন। শত্রুর অন্তর্ব্বল জিজ্ঞাসিলে হনুমান উত্তর করিলেন, লঙ্কাপুরী হস্তী অশ্ব রথে পরিপূর্ণ, চতুর্দ্দিকে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর, অর্গলযুক্ত প্রকাণ্ড চারিটি দ্বারে প্রস্তর শর ও যন্ত্রসজ্জিত অসংখ্য লৌহময় সুতীক্ষ্ণ শতঘ্নী সংগৃহীত। প্রত্যেক দ্বারে যন্ত্রলম্বিত এক একটি বিস্তীর্ণ সেতু নক্রকুম্ভীরপরিপূর্ণ পরিখার

উপরিদেশে সমাহিত থাকিয়া প্রতিপক্ষের সৈন্যকে যন্ত্রবলে অগাধজলে নিক্ষেপ করে। রাক্ষসরাজ যুদ্ধার্থী কিন্তু ধীর-স্বভাবও সাবধান; স্বয়ংই সতত সৈন্যপর্য্যবেক্ষণ করেন। সৈন্যগণ রাজভক্ত, খড়্গ চর্ম্মশূলধারী ও তাহাদের মধ্যে আবার অগণ্য রথী ও অশ্বারোহী। আমি লঙ্কার সেতু ভগ্ন ও পরিখা পূর্ণ করিয়া দিয়া আসিয়াছি, সমস্ত পুরী ভস্মসাৎ ও প্রাকার ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে যে কোন উপায়ে হউক সমুদ্র পার হইতে পারিলেই রাক্ষসকুল বিনির্ম্মূল হইবে।

বানরসৈন্য নিষ্ক্রান্ত হইল। নীল পথপরীক্ষার্থ অগ্রযায়ী হইল এবং যাহাতে বিপক্ষেরা বিষ সংযোগ দ্বারা গন্তব্যপথের ফলমূল দূষিত করিতে না পারে, তৎবিষয়ে সাবধান হইল। কেহবা অরণ্যে গিয়া বিপক্ষের গুপ্ত সৈন্য অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে তাহারা সমুদ্রতীরে উপনীত হইয়া স্কন্ধাবার স্থাপন করিল। দেখিল ভীষণ বারিধি প্রচণ্ড বায়ুবেগে নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলিত হইতেছে। উহার কোথাও উদ্দেশ নাই, চতুর্দ্দিক অবাধে প্রসারিত থাকিয়া অনবরত ফেন উদ্গার পূর্ব্বক যেন হাস্য করিতেছে ও তরঙ্গবশে অবিরাম নৃত্য করিতেছে।

রাম লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন, দেখ, আমি জানকীর সহিত এক পৃথিবীতে আছি, এই আমার পক্ষে যথেষ্ট; বলিতে কি জানকী জীবিত আছেন এই প্রবোধেই আমি প্রাণ ধারণ করিতেছি। হায়! কবে আমি যুদ্ধে জয়ী হইয়া জানকীকে দেখিতে পাইব।

এদিকে রাক্ষসরাজ এক হনুমানের বলদর্প সন্দর্শনেই যার পর নাই চিন্তিত হইয়া শ্রেয়ঃকল্প নির্দ্ধারণার্থ রাক্ষসসভা আহ্বান করিলেন। রক্ষোকুল সমবেত হইল, সকলকেই যুদ্ধ-প্রয়াসী দেখিয়া বিভীষণ সবিনয়ে রাক্ষসরাজকে নিবেদন করিল, মহারাজ! সাম দান ভেদ এই ত্রিবিধ উপায়ে যে কার্য্যসিদ্ধি না হয়, তৎপক্ষেই যুদ্ধব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট। রাম প্রমাদী নহেন যে তোমরা তাঁহাকে আক্রমণের ইচ্ছা করিতেছ। সীতাকে নির্ব্বিবাদে রামহস্তে প্রত্যর্পণ কর, বৃথা অধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না। রাবণ! তুমি আমার ভ্রাতা, আমার এই হিতকর অনুরোধ রক্ষা কর। কিন্তু দশগ্রীব সর্ব্বভূতাপহারী কালপাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন, বিভীষণের বাক্য তাঁহার নিকট বিষবৎ প্রতীত হইল। ফলত, রাক্ষসরাজ নির্ম্মম কঠোর বাক্যে বিভীষণের অন্তঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। বিভীষণও বর্ম্মপরিহিত চারিজন অনুচর সহ রাক্ষসপুরী পরিত্যাগ করিয়া শূন্যপথে সমুদ্রের উত্তর পারে রামশিবিরে উপনীত হইয়া নিজ পরিচয় প্রদানে রামের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন।

বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নল উৎসাহের সহিত সেতু-নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। বানরেরা অরণ্য হইতে প্রকাণ্ড বৃক্ষ আকর্ষণ করিয়া আনিল ও হস্তিপ্রমাণ পাষাণ পর্ব্বত সকল উৎপাটন পূর্ব্বক যন্ত্রযোগে বহন করিতে লাগিল। কেহ সুদীর্ঘ সেতুর অবক্রভাব রক্ষা করিবার জন্য সূত্র, কেহ বা মানদণ্ড গ্রহণ করিল। অচিরে সেতু বিনির্ম্মিত হইয়া অন্তরীক্ষে ছায়াপথের ন্যায়—মহাসাগরের সীমন্তের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। রামও ব্যূহরচনা করিয়া অতিবেগে সসৈন্যে সমুদ্রের পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন।

বানরসৈন্য লঙ্কা অবরো... ল। রাক্ষসগণ দ্বিগুণ বিধানে দ্বাররক্ষার ...বস্থা করিল; বানরেরা তৃণকাষ্ঠপাষাণে স্বচ্ছ-সলিলবাহী পরিখা পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইল; দুইপক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। দিবাবসানে আবার নিশাযুদ্ধ।

রাম ও লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিত-পরিত্যক্ত অমোঘ নাগপাশে বদ্ধ হইলেন। চারিদিকে হাহা-কার পড়িয়া গেল। কিন্তু গরুড়ের কৃপায় তাঁহারা সংজ্ঞা লাভ করিলেন, ব্রণমুখ শুষ্ক হইয়া গেল। এই কালব্যাপী মহাসমরে অবিরাম যুদ্ধরূপ সঙ্গীত বিদ্যার অনুশীলন হইতে লাগিল। শরাসন-জ্যা ঐ সঙ্গীতের বীণা, হনুমান সৈন্যগণের কণ্ঠনলী-নিঃসৃত হিক্কা তাল, মাতঙ্গগণের বৃংহিতরবই সঙ্গীত। রাক্ষসপক্ষ হইতে একে একে মহারথী ধূম্রাক্ষ, বজ্রদংষ্ট্র, অকম্পন, প্রহস্ত বিনষ্ট হইলে রাবণ নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তুমুল রণ আরম্ভ হইল। রাবণপ্রেরিত শক্তি-শেল লক্ষ্মণ-শরে দ্বি...-খণ্ডিত হইয়াও মহাবেগে লক্ষ্মণের বিশাল বক্ষে প্রবেশ করিল। লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রাবণ তাঁহাকে নিজ ভুজপঞ্জরে গ্রহণ করিবার চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু উত্তোলন করিতে না পারিয়া তিনি যে বিষ্ণুর অপরিচ্ছিন্ন অংশ তাহা স্মরণ করিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ যদিও শত্রুগণের অপ্রকম্প্য তথাপি হনুমানের সখিত্ব ও ভক্তি নিবন্ধন অত্যন্ত লঘুভার হইলেন। হনুমান তাঁহাকে রামের নিকট আনয়ন করিলেন, লক্ষ্মণও আপনাকে বিষ্ণুর অংশ জানিয়া নীরোগ হইলেন।

আমরা বাল্মীকি-রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের যত দূর আসিয়াছি, তাহার মধ্যে ৫৯অধ্যায়ে লক্ষ্মণের দেবত্ব সম্বন্ধে এই সামান্য উল্লেখ দেখিতে পাই। এখানে আছে লক্ষ্মণ বিষ্ণুর অংশভূত, তাঁহার পূর্ণত্ব নাই। একথা বিশেষ মারাত্মক না হইলেও এই স্থানের মৌলিকতা সম্বন্ধে আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ। প্রথমতঃ বাল্মীকি রামায়ণ হইতে আমরা যেরূপ দেখাইয়া আসিয়াছি তাহাতে কোথাও লক্ষ্মণকে বিষ্ণুর অংশভূত বলা হয় নাই। বলিলেও পূর্ব্বের সহিত আদৌ সঙ্গতি থাকে না। বিষ্ণুরূপী রামচন্দ্রকে সখ্যভাবে সাধনের ব্যবস্থা অধ্যাত্ম রামায়ণেই আছে, বাল্মীকি রামায়ণে নাই। পরবর্ত্তী লেখকগণের হস্তে ইহা কোন রূপে বাল্মীকি রামায়ণে প্রবেশ করিয়াছে। যাঁহারা এই দুই রামায়ণের এরূপ অল্পাধিক আদান প্রদান আদৌ বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদিগকে ইহাই বলিলে পর্য্যাপ্ত হইবে যে আমাদের নিকটে দুইখানি অধ্যাত্ম রামায়ণ গ্রন্থ আছে: তন্মধ্যে একখানি বঙ্গবাসী কার্য্যালয়ের। প্রাগুক্ত গ্রন্থে বেশ্যাগণ কর্ত্তৃক জঘন্য উপায়ে ঋষ্যশৃঙ্গের আনয়নবৃত্তান্তের বিন্দুমাত্র উল্লেখ নাই এবং এরূপ অধ্যাত্মতত্ত্ব পরিপূর্ণ গ্রন্থে থাকাও সঙ্গত নহে। কিন্তু অপরটীতে আছে। শেষোক্ত গ্রন্থে বালকাণ্ডের শ্লোক ও সর্গ সংখ্যাও অধিক। ইহাত গেল সর্গ লইয়া গণ্ডগোল; ইহা ব্যতীত অন্যবিধ গোল-যোগের সংখ্যাও বিরল নহে। তবে সুবিধার মধ্যে এই বড় কেহ রামের অবতারত্ব লইয়া স্বরচিত শ্লোকে উত্তরকাণ্ড ব্যতীত বাল্মীকি রামায়ণের অন্যান্য কাণ্ডের অঙ্গ পুষ্টি করিতে সাহসী হন নাই, যাহা কিছু হইয়াছে কাব্যাংশে।

সে যাহা হউক লক্ষ্মণকে মূর্চ্ছিত ও পরাজিত দেখিয়া রাম নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। রাবণ রামের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া হতগর্ব্ব ও বিষণ্ণ

হইয়া সহসা পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন ও অনন্যোপায় হইয়া ঘোরনিদ্রাচ্ছন্ন নিজ-ভ্রাতা কুম্ভকর্ণকে প্রবুদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন। বহুকষ্টে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। কুম্ভকর্ণের কালব্যাপী নিদ্রার বিষয় পাঠে মনে হয় যে তিনি অসীম বলশালী পুরুষ কিন্তু অলস প্রগল্‌ভ ও দীর্ঘসূত্রী, সহজে কোন কার্য্যে তাঁহাকে উত্তেজিত করা যাইত না। ইহা হইতেই কবির অতিরঞ্জন। কৃতান্ততুল্য কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ও অসংখ্য বানরগণকে বিদ্রাবণ ও ভক্ষণ করিয়া পরিশেষে রাম-শরে নিহত হইলেন। রাক্ষসবীর নারান্তক দেবান্তক, মহোদর, মত্ত, অতিকায় বিনষ্ট হইলে স্বয়ং ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধভূমিতে উপস্থিত হইয়া রথের চতুর্দ্দিকে রাক্ষসগণকে স্থাপন করিলেন। ঐ স্থানের নাম নিকুম্ভিলা। অগ্নিবৎ তেজস্বী ইন্দ্রজিৎ তথায় জয়সম্পাদক হোমের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিলেন। বিধূম বহ্নি জ্বালা বিস্তার পূর্ব্বক জ্বলিয়া উঠিল। অগ্নির যে সমস্ত জয়-সূচক চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে ক্রমশঃ তৎসমুদয় অভিব্যক্ত হইল। রাক্ষস-সৈন্য সিংহনাদ সহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ইন্দ্রজিৎ অন্তরীক্ষে থাকিয়া বিবিধ অস্ত্র গ্রহণে বানরগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন এবং শত্রুপক্ষকে নিপীড়িত করিয়া জয়শ্রী অধিকার পূর্ব্বক রাক্ষসগণের স্তুতিবাদের মধ্যে রাবণ-রক্ষিত লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন।

রজনীর ঘোর অন্ধকারে চারিদিক সমাচ্ছন্ন হইলে রাম ও লক্ষ্মণ জ্বলন্ত উল্‌কা লইয়া রণক্ষেত্রে আহত বীরগণের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন পর্ব্বতাকার বানরসৈন্য মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিয়াছে। জাম্ববানের পরামর্শে হনুমান কর্ত্তৃক হিমা-চ… হইতে বিশল্যকরণী, মৃতসঞ্জীবনী, …ণকরণী ও সন্ধানী এই চারিপ্রকার ঔষধি … আনীত হইল। ঔষধি প্রভাবে বানর সৈন্য সুপ্তোত্থিতের ন্যায় বীতশল্য নীরোগ ও জাগ্রত হইয়া উঠিল। সূর্য্য অস্তমিত হইলে সুগ্রীব হনুমানকে কহিলেন, এই অবসরে ক্ষিপ্রকারী বানরগণ উল্‌কা গ্রহণ পূর্ব্বক লঙ্কায় গিয়া পড়ুক। প্রদোষে বানরগণ লঙ্কাপুরীর চারিদিকে অগ্নিপ্রদান করিল। দেখিতে দেখিতে হুতাশন করাল শিখা বিস্তার পূর্ব্বক জ্বলিয়া উঠিল। রাক্ষসগণ সভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তকাল মধ্যে অসংখ্য প্রাসাদ দগ্ধ হইয়া পড়িতে লাগিল। কুম্ভকর্ণের পুত্র কুম্ভ ও নিকুম্ভ সেই রাত্রিতেই বানরগণের বিরুদ্ধে অভিযান করিল। যূপাক্ষ শোণিতাক্ষ প্রজঙ্ঘ ও কম্পন তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইল। উভয় পক্ষে দারুণ সৈন্যক্ষয় হইতে লাগিল। [illegible] রাক্ষসবীরগণ একে একে সকলেই নিহত হইল। অতঃপর খর-পুত্র মকরাক্ষ রণে বিনষ্ট হইলে আভিচারিক হোমক্রিয়া সমাপনান্তে ইন্দ্রজিৎ স্বয়ং রণে বাহির হইলেন। কিয়ৎকাল যুদ্ধ করিয়া পুরমধ্যে প্রবেশানন্তর রথোপরি এক মায়াময়ী সীতাসহ বাহির হইলেন এবং শত্রুগণ সমক্ষে তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া খড়্গ প্রহারে যজ্ঞোপবীতবৎ তির্য্যকভাবে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। হনুমানপ্রমুখ বানর সৈন্য তদ্দর্শনে হাহাকার করিতে লাগিল, এবং নিরাশমনে রণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল। ইন্দ্রজিৎও অবসর বুঝিয়া নিকুম্ভিলায় প্রবেশ করিলেন।

বিভীষণ আসিয়া সকলকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন জানকী বিনষ্ট হন নাই। ইন্দ্রজিৎ মায়াময়ী সীতাকে বধ করিয়া

বানরগণকে বিমোহিত করিয়া পুনরায় হোমক্রিয়ার উদ্যোগ করিতেছে। এই অবসরে তাহাকে বাধা দিতে না পারিলে সে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিবে। আইস আমরা সসৈন্যে নিকুম্ভিলায় প্রবেশ করিয়া যজ্ঞবিঘ্ন উৎপাদন করি।

লক্ষ্মণ রামের নির্দ্দেশক্রমে ইন্দ্রজিৎ বধে বাহির হইলেন। রাক্ষসসৈন্যের সহিত বানরগণের ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। স্বসৈন্য পীড়িত ও বিষণ্ণ শুনিয়া ইন্দ্রজিৎ আভিচারিক হোমশেষের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিলেন ও হনুমানের বিনাশ কামনায় তাহার দিকে রথ পরিচালিত করিলেন। লক্ষ্মণও এই সুযোগে বিভীষণের নির্দ্দেশ ক্রমে নিকুম্ভিলায় প্রবেশ করিলেন। এইখানে ইন্দ্রজিৎ যে অদ্ভুত রণকৌশল দেখাইলেন তাহা বাস্তবিকই অনির্ব্বাচ্য। কিন্তু নিয়তি কে খণ্ডন করিবে। ইন্দ্রজিৎ বিভীষণের পরামর্শচালিত লক্ষ্মণের হস্তে হত হইলেন।

অনন্তর মহাবল বিরূপাক্ষ মহোদর ও মহাপার্শ্ব প্রভৃতি রাক্ষসবীর বিনষ্ট হইলে রক্ষকুলপতি নিজে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন, রামের সহিত তুমুল রণ আরম্ভ হইল। রাবণ হস্তনিক্ষিপ্ত শক্তি মহাতেজে লক্ষ্মণের বক্ষভেদ করিল। লক্ষ্মণ মৃতের ন্যায় হতচেতন হইয়া পড়িলেন। রাবণ রামের তেজ অধিক কাল সহ্য করিতে না পারিয়া বাতাহত মেঘের ন্যায় রণস্থল হইতে পলায়ন করিল। সুষেণের চিকিৎসা কৌশলে বিশল্যকরণীর আঘ্রাণগুণে লক্ষ্মণের চেতনা ফিরিয়া আসিল। রাবণ যুদ্ধার্থ পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু রামশরে রাবণকে নিতান্ত প্রপীড়িত দেখিয়া সারথি সভয়ে রণস্থল হইতে রথ অপবাহিত করিল।

ক্ষণকাল পরে রাবণ মোহমুক্ত হইয়া সারথিকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, কেন তুমি অকারণে রথ অপসারণ করিলে? নিশ্চয়ই তুমি শত্রুর উৎকোচে বশীভূত হইয়া থাকিবে। সারথি কহিল, আপনি যুদ্ধশ্রমে ক্লান্ত ও হীনবল, অশ্ব নিরুদ্যম ও অসক্ত হইয়াছিল, বিশেষতঃ চতুর্দ্দিকে দুর্নিমিত্ত দৃষ্ট হইতে লাগিল, তাই আমি বিপদ বুঝিয়া সাবধান হইয়াছিলাম। এক্ষণে যেরূপ ইচ্ছা হয়, আদেশ করুন। রাবণ কহিল, সারথি, তুমি শীঘ্র রণস্থলে চল; এই বলিয়া উহাকে হস্তাভরণ পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করিলেন। সারথিও "ক্ষণেন রামস্য রণাগ্রতোঽভবৎ" ক্ষণকাল মধ্যে রথ লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে রামের নিকট উপস্থিত হইল। (১০৫ সর্গ, শেষ শ্লোক)।

১০৬ তম সর্গের মৌলিকতা সম্বন্ধে আমাদের আবার সন্দেহ উপস্থিত। আমাদের বিবেচনায় এ সর্গ ও পরবর্ত্তী সর্গের ১ম হইতে ৮ম শ্লোক আদৌ বাল্মীকির লেখা নহে। প্রক্ষেপকর্ত্তা অবসর বুঝিয়া এই সর্গে চিরপরিচিত আদিত্যহৃদয় শ্লোকাবলী অগস্ত্যমুখে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

রাবণকে রথোপরি সমাগতপ্রায় দেখিয়া মহর্ষি অগস্ত্য রামচন্দ্রকে আসিয়া বলিতেছেন, বৎস! তুমি যাহার প্রভাবে শত্রুনাশ করিতে পারিবে, সেই আদিত্য হৃদয় নামক সনাতন শ্লোক শ্রবণ করাইতেছি। ইহা চিন্তাশোকনাশক, আয়ুপরিবর্দ্ধক ও জীবের মুক্তিপ্রদ। এই বলিয়া উহা রামকে শুনাইলেন, সর্গ শেষ হইয়া গেল। ১০৭তম সর্গের নবম শ্লোকে আছে;

উবাচ মাতলিং রামঃ সহস্রাক্ষস্য সারথিম্।
মাতলে পশ্য সংরব্ধমাপতন্তং রথং রিপোঃ। ৯

রাম মাতলিকে (ইন্দ্র রামের সাহায্যার্থ লঙ্কায় মাতলি সহ নিজ রথ পাঠাইয়াছিলেন, রাম ঐ রথে আরোহণ করিয়া রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করেন) সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ঐ দেখ রাবণের রথ মহাবেগে আসিতেছে, অতএব প্রস্তুত হও ইত্যাদি। আমাদের বক্তব্য এই যে ১০৫ সর্গের অন্তে, ১০৭ সর্গের এই অংশ ঠিক পরবর্ত্তী ১০৬ সর্গে সন্নিবেশ করিতে গিয়া, পূর্ব্বের সহিত যোগ রক্ষার জন্য ১০৭ সর্গের প্রথম ৮টি শ্লোক সংযোজনের আবশ্যক হইয়াছে। আগামী বারে ইহার যুক্তি দিবার ইচ্ছা রহিল।

ক্রমশঃ।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৮, বৈশাখ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩৭৯৷৴০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৬৪৩৷৶০
সমষ্টি	...	১০২২৸০
ব্যয়	...	৩৯৯৸০
স্থিত	...	৬২৩৲

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন এক কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲
হাওলাত শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু	৭৲
সমাজের ক্যাশে মজুত	১১৬৲
	৬২৩৲

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ১২৮৷৷০

নববর্ষের দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পারিবারিক দান ১৬৷৷০

শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ সরকার ১৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০০৲

সাম্বৎসরিক দান।

ডি, এন্, চট্টোপাধ্যায় স্কয়ার ১৲

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ১০৲

১২৮৷৷০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ৪৩৸৴০

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়,	কলিকাতা	১২৲
" " শ্রীগোপাল মল্লিক,	ঐ	৬৲
" " হরিমোহন নন্দী,	ঐ	২৷৷০
" " দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী,	ঐ	২৷০
" " জয়গোপাল সেন,	ঐ	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়,	ঐ	১৲
" " গোপালচন্দ্র দে,	ঐ	১৲
" " কানাইলাল দাস,	ঐ	৩৲
" " রাধাচরণ বর,	দহগড়া	৩৷৶০
" " কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস,	ঝাল্দি	১৸৶০
" " চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত,	পাণ্ডুয়া	৩৷৶০
পি, কে, রায় স্কয়ার,	বালীগঞ্জ	৬৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এক খণ্ড নগদ বিক্রয়		।৶০
		৪৩৸৴০

পুস্তকালয়	...	৬৷০
যন্ত্রালয়	...	২০০৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৸০
সমষ্টি		৩৭৯৷৴০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৭১৶৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩১৷৶৩
পুস্তকালয়	...	২০৲
যন্ত্রালয়	...	১৭৭৶০
সমষ্টি	...	৩৯৯৸০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৯ আষাঢ় মঙ্গলবার রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় ভবানীপুর পঞ্চচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক। মহাশয়েরা যথা সময়ে ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়া উপাসনা করিবেন।

শ্রীপ্রিয়শঙ্কর মজুমদার।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দ্দশ কল্প।

তৃতীয় ভাগ।

শ্রাবণ ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৮।

৬৪৮ সংখ্যা ১৮১৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवाएकमिदमग्रआसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

শকাব্দা ১৮১৯। ৩০ বৈশাখ বুধবার।

ভয়।

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন।"

কত কাল পূর্ব্বে ঋষিরা এই মহা মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন, আমরা আজি তাহাই উৎসাহের সহিত বলিতেছি, যিনি সেই আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মকে জানেন—আপনার পিতা মাতা ও রক্ষক বলিয়া জানেন, তিনি আর কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না। মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বর কিন্তু এই ভয়কে আত্মরক্ষার জন্যই আমাদের মনে নিহিত করিয়া দিয়াছেন। শরীর ধন মান স্ত্রী পুত্র ইত্যাদি যতক্ষণ আমাদের কিছু না কিছু রক্ষা করিতে হইবে, ততক্ষণ ভয় যে হৃদয়ে চাপিয়া থাকিবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি?

কিন্তু এই ভয়ের মাত্রা সীমা অতিক্রম করিলে, বা সামান্য সামান্য বিষয়ে সতত অকারণ আশঙ্কা হৃদয়ে স্থান পাইলে, শরীর মনের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হয়। পবিত্র ভোগের বস্তুও ভোগ কবিবার শক্তি অন্তর্হিত হয়, এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন গুরুতর বিপদ আসিয়া উপস্থিত হয়।

কত লোক ভয়ে উন্মত্ত হইয়া গিয়াছে, কত লোক আত্মহত্যা করিয়াছে। অনেকেই বিদিত আছেন, দুশ্চিন্তা-প্রভাবে এক যুবা পুরুষের মাথার কাল চুল এক রাত্রির মধ্যেই শ্বেত বর্ণ ধারণ করিয়াছিল। কি যাতনাময়ী বিভাবরী! অতএব দয়াময় পরমেশ্বরের দয়ার উপর বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া আমরা যেন নিঃশঙ্ক হইতে যত্নবান হই। পূর্ব্বোক্ত আত্মরক্ষাদির স্থল ব্যতীত ভয়ের অপর দুইটি কারণ সংঘটিত হইতে পারে। তন্মধ্যে একটি নরহত্যা প্রভৃতি গুরুতর অপরাধ, অন্যটি আমাদের মানসিক দুর্ব্বলতা-জনিত সামান্য সামান্য দোষ ত্রুটি ইত্যাদি। সেই দুর্দ্দান্ত দস্যু যে ঈশ্বরকে ভয় করিতে চায় না, যথাকালে সেই "ভীষণং ভীষণানাং" তাহার হৃদয়ে ভয়ের প্রবল ঝটিকা তুলিবেনই তুলিবেন। বিষাদের অন্ধকারে—যাতনার বাণে তাহাকে আচ্ছন্ন করিবেনই করিবেন। ইংলণ্ডের

সেই বলদর্পী রাজনীতিজ্ঞ সাধারণের স্বত্ব রক্ষার ছলে আপনার অন্তরস্থ প্রবল লোভ চরিতার্থ করিবার জন্য তাৎকালিক ইংলণ্ডের রাজাকে সিংহাসন হইতে টানিয়া আনিয়া হাড়িকাঠে বলিদান দিলেন। সেই ন্যায়দর্শী ভগবান কি ঐ নিষ্ঠুর ব্যক্তির হৃদয়ে উৎকট ভয়ের স্থষ্টি করেন নাই? সেই দিন সেই দুঃখের দিনে যখন প্রজাপুঞ্জ চক্ষের জলে ভাসিয়া গেল, কত কোমলপ্রাণ কামিনীগণ মূর্চ্ছিত হইল, সেই সময় হইতেই ঐ রাজনীতিজ্ঞের সুখ গেল, শান্তি গেল, নিদ্রা গেল, সব গেল। তাহার নিজ পরিবার মধ্যেও তিনি সুখী ছিলেন না। স্ত্রী পুত্র কন্যাও তাঁহাকে আর সুচক্ষে দেখিত না। সদাই মলিন সদাই বিষণ্ণ! আবার নিজে প্রাণভয়েই অস্থির। যে পথ দিয়া বেড়াইতে যাইতেন, ফিরিবার সময় আর সে পথ দিয়া আসিতেন না। বস্ত্রাবরণের নিম্ন ভাগেই তিনি লৌহ-নির্ম্মিত বর্ম্মে সজ্জিত থাকিতেন।

হায়! তাঁহার সাধের রাজ্য—মাকড়সার জাল চারি বৎসর মধ্যেই তাঁহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার হৃদয়—সেই লৌহময় হৃদয় ভগ্ন হইল, তিনি জন্মের মত চক্ষু মুদিলেন। এখানে ত এই যাতনা—না জানি পরলোকে তাঁর জন্য কি কঠোর শাস্তিই অপেক্ষা করিতেছে!

সেই প্রবল প্রতাপান্বিত দিল্লির সম্রাট যিনি তাঁর পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন, ভ্রাতৃগণকে প্রাণে মারিলেন, কি না নির্ভয়ে রাজ্যভোগ করিবেন—ভোগ সুখের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু নির্ভয় অবস্থা ও সুখ তাঁহাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিল। তাঁহারও নিদ্রা গেল—শান্তি গেল। তাঁহার শত শত শয়নকক্ষ ছিল, যেটিতে এক রাত্রি থাকিতেন, সেটিতে আর অন্য রাত্রিতে থাকিতেন না। কে কখন তাঁহাকে হত্যা করিবে, এই আশঙ্কাই তাঁহার প্রবল হইয়া ছিল। তিনি সুখের আশয়ে বহুমূল্য মণি মাণিক্য খচিত ময়ূরাসনে বসিতেন, কিন্তু আমি এখান হইতে দেখিতেছি, সে সকল সাপের মাথার মাণিক। জীবন্ত সর্প সকল তাঁহার সিংহাসন বেষ্টিত করিয়া তাঁহাকে যেন দংশন করিতেছে। তাহাদের বিষে তাঁহার হৃদয় অনুক্ষণ জর্জ্জরিত থাকিত।

সেই দুর্দ্দান্ত রাবণ যে রাক্ষস মারীচের সহায়তায় বিশ্বাসঘাতকতারূপ উপায় অবলম্বন করিয়া সীতাকে হরণ করিয়াছিল তার দুর্গতির কথা কে আর না জানে? স্বর্ণলঙ্কা অগ্নিসংযোগে ধূধূ করিয়া জ্বলিয়া গেল। কাঠুরিয়া যেমন অগ্রে মহাদ্রুমের শাখা প্রশাখা কাটিয়া পরে তাহার মূলে কুঠারাঘাৎ করিয়া তাহাকে ধরাশায়ী করে রাম তেমনি করিয়া তাহার পুত্র পৌত্র ঝাড়েবংশে যে যেখানে ছিল নিধন করিয়া পরিশেষে তাহাকে বধ করিলেন। এইরূপে এখানেই যে ব্যক্তি আপন কুপ্রবৃত্তি ও কুসংস্কারের বশীভূত হইয়া পরের চক্ষের জল আকর্ষণ করে, তার ও এক দিন ঐরূপ দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে। ঈশ্বর সহস্র প্রকার ভয়ে তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিবেন। তাঁহার খড়্গে এক দিন তাহাকে ছিন্ন ভিন্ন হইতে হইবে।

কিন্তু যে ব্যক্তি এই প্রকার পাপ হৃদয়ে পোষণ না করে, এই প্রকার পাপ অনুষ্ঠান না করে, ঈশ্বর ও ধর্ম্মের পথে চলিবার যাঁহার মন আছে—তিনি যদি তাঁর স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা, দৃঢ় কুসংস্কার বা

প্রগাঢ় বিবেচনার দোষে এমন কোন কর্ম্ম করিয়া ফেলেন, যার জন্য তাঁর হৃদয়ে ভয় উপস্থিত হয়, ভবিষ্যতের জন্য ব্যাকুল হইতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার ঈশ্বরের দিকেই সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করাই ভয় হইতে মুক্ত হইবার এক মাত্র উপায়। দুর্ব্বলের বল ঈশ্বরই তাঁহার সহায় আছেন। সেই অভয়দাতা দয়াময় পিতার শরণাপন্ন হইলে অবশ্যই তিনি তাহাকে ভয় হইতে মুক্ত করিবেন। মনুষ্যকৃত অপমান আর তাঁহাকে কতক্ষণ কাতর করিতে পারে? তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে করুণাময়ী মাতা স্বয়ং তাঁহার অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া চির দিনের জন্য আপনার স্নেহময় অমৃতময় ক্রোড়ে স্থান দিবেন। রোগ শোক এমন কি মৃত্যুও তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিতে পারে না। যিনি ঈশ্বরের চক্ষের সমক্ষে পবিত্র ও নিষ্পাপ থাকিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করেন, তাঁর কি সামান্য ত্রুটি ও দৈব দুর্ব্বিপাকে ভীত হওয়া সঙ্গত? "বিপদভয় বারণ যে করে ওরে মন তাঁরে কেন ডাক না" এই মন্ত্রেই তাঁর নিশ্চয়ই উদ্ধার সাধন হইবে। আর অকারণ ভয়ের বিষয় যাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, সে বিষয়ে ভাল করিয়া বিবেচনা করিলে, ভয়ের অসারতা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। যাহা ঘটিবে বলিয়া ভয় হইতেছে, তাহা নাও ঘটিতে পারে। এই লতা যাহা স্রোতে ভাসিয়া বেগে আমাদের পদতলে আসিবার উপক্রম করিতেছে এমন একটা ঝটিকা সহসা উঠিতে পারে, যে সেটা আর আমাদের দিকে না আসিয়া বিপরীত পথে যাইতে পারে। অনেক পতনোন্মুখ বিপদকে ঈশ্বর তাঁহার পদানত ভৃত্যের উদ্ধারের জন্য অর্দ্ধপথ হইতেই ফিরাইয়া দেন। হৃদয়ের উপর যে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব আছে—তিনি অশুভ-ইচ্ছাকারীর হৃদয়ে, সহসা শুভ ইচ্ছা প্রেরণ করিয়া তাঁহার পদানত ভৃত্যকে আততায়ীর হস্ত হইতে রক্ষা করেন।

দ্বিতীয়তঃ যে ভাবী বিপদভয়ে আমরা ব্যাকুল হই, তাহা যদিও উপস্থিত হয়, হয়ত তত অসহনীয় না হইলেও হইতে পারে। সৌভাগ্যের সময় যেমন কোন না কোন একটা অসুবিধা উপস্থিত হয়, দুর্ভাগ্যের সময়ও তেমনি কোন না কোন একটা মঙ্গলের পথ মানুষ দেখিতে পায়।

ইহ জীবনের দুঃখ দারিদ্র্য দূর হইতে কঠোর তৃণশূন্য পর্ব্বতের ন্যায় দৃশ্যমান হয়। কিন্তু নিকটস্থ হইলেই দেখা যায়, যে তথায় শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র শ্রান্তিহর প্রস্রবণ রহিয়াছে, কেবল আসে পাশে শ্রীহীন শৈল খণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে মাত্র। পরিশেষে একটি বিশেষ প্রবোধজনক কথা বলিতেছি। আশঙ্কিত ভাবী বিপদ যেমন আমাদের নিকট নাও আসিতে পারে, আমরাও ত তেমনি তার নিকট নাও পঁহুছিতে পারি। অর্থাৎ বিপদে পড়িবার পূর্ব্বেও ত এখান হইতে লোকান্তরে যাইতে পারি। যে পরীক্ষায় আমরা স্থির থাকিতে পারিব না, তাহার সম্মুখীন হইবার পূর্ব্বেই হয়ত ঈশ্বর দয়া করিয়া আমাদিগকে শরীর হইতে বিযুক্ত করিতে পারেন। কিন্তু আমরা যদি প্রাণপণে তদ্গতচিত্তে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করি, তাহা হইলে, কল্পনাসৃষ্ট বা প্রকৃত বিপদরূপ উচ্চপর্ব্বতচূড়া হইতে পড়িয়া কখনই চূর্ণ বিচূর্ণ হইব না। বাজিকর যেমন উচ্চস্থিত রজ্জুর উপর চলিবার সময় বংশযষ্টির ঠিক্ মধ্য বিন্দুতে চক্ষু রাখিয়া

নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যায়, আসে পাশে ভয়ের সহিত দৃষ্টিপাত করে না, আমরাও যদি তেমনি সংসারের দুর্গম পথে চলিবার সময় সভয়ে কোন দিকে না চাহিয়া কেবল মাত্র দয়াময়কে স্মরণ করিয়া চলিয়া যাই, তাহা হইলে আমরা কেন বিপদ রূপ পর্ব্বত হইতে পতিত হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইব? করুণাময়ী মাতা নিশ্চয়ই আমাদিগকে বক্ষে করিয়া ধরিবেন। এই জন্যই শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন,

"আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন"।

কোথা গো দয়াময়ী মা! তোমার কাতর সন্তানে দেখা দেও, দেখা দাও। মা! ভব অন্ধকারে দারুণ ভীত হইয়াছি। মা তোমার ভব সমুদ্রে প্রবল ঝঞ্চা বায়ু উঠিয়াছে—তরঙ্গাঘাতে দেহ-তরী মন-তরী অস্থির, অতলজলে ডুবি—ত্রাহি মা ত্রাহি, তোমার হস্তাবলম্বন দাও। জননী বলিয়া ডাকার সার্থকতা হউক। আর তোমাকে কি বলিব।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অদ্বৈতমতের সমালোচনা।

পরিশিষ্ট।

আমার বক্তৃতা পাঠের অন্তে সুবিদ্বান শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এরূপ কঠিন বিষয়ে অবলীলা-ক্রমে যেরূপ সুস্পষ্ট বচনে আপনার মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া আমি এবং আমার ন্যায় অনেকেই তাঁহার বিশিষ্টরূপ ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। এক্ষণে, তিনি আমার বক্তৃতার কয়েকটি স্থানে যে-সব সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন—সংক্ষেপে তাহা নিরাস করা আমি কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছি।

আমি যেরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া দেখাইয়াছি যে, নির্গুণ একত্ব সাধকের প্রয়াণ-স্থান এবং সগুণ একত্ব সাধকের গম্যস্থান, তাহার কোনো উল্লেখ না করিয়া হীরেন্দ্র বাবু বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা নির্গুণ একত্বকেই গম্যস্থান বলিয়াছেন—প্রয়াণ স্থান বলেন নাই, আর, তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহা বিনা-তর্কে শিরোধার্য্য করা কর্ত্তব্য। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য যেরূপ তীব্রভাবে মহামুনি কপিলের মত তন্ন তন্ন করিয়া যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন, আর, তেমনিই প্রবল যুক্তি দ্বারা সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র-ভাষ্যে অদ্বৈতবাদের মূলে যেরূপ কুঠার আঘাত করা হইয়াছে, তাহা জানিলে হীরেন্দ্র বাবু এরূপ কথা বলিতে কখনই সাহস করিতেন না যে, পূর্ব্বতন আচার্য্যদিগের কৃত দার্শনিক আলোচনায় যুক্তির কোনো হস্ত ছিল না, আর, সেই কারণে তাহা বর্ত্তমান কালে যুক্তি দ্বারা বিচার করিবার বস্তু নহে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য আমাদের দেশের যেমন পরম পূজ্য, মহামুনি কপিল ততোধিক; তাহা সত্ত্বেও সাংখ্য মত এবং অদ্বৈত মত কিরূপ তীক্ষ্ণ যুক্তি-অস্ত্র দ্বারা পরস্পর কর্ত্তৃক খণ্ডিত হইয়াছে—শারীরক ভাষ্যে এবং সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র-ভাষ্যে অনুসন্ধান করিলেই হীরেন্দ্র বাবু তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইতে পারেন। তা ছাড়া—মীমাংসা-দর্শনকার একথা বলিতে ছাড়েন নাই যে, "যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।"

আমি আমার বক্তৃতায় সুস্পষ্ট যুক্তি দ্বারা দেখাইয়াছি যে, অদ্বৈতবাদীরা জীবেশ্বরের নির্গুণ একত্বকে সাধনের প্রয়াণ-স্থান বলিলেই ঠিক হইত;—গম্য স্থান বলিয়াছেন বলিয়াই আমি তাঁহাদের সে

কথায় সায় দিতে পারি না—কেন পারি না তাহার কারণও স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়াছি। হীরেন্দ্র বাবু তাহার পরে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মে সজাতীয় বিজাতীয় স্বগত কোনো প্রকার ভেদ নাই—আমিও তাহাই বলি; সুতরাং এবিষয়ে হীরেন্দ্র বাবুর সহিত আমার বিন্দু মাত্রও মতভেদ নাই। হীরেন্দ্র বাবু শাস্ত্রোক্ত এ কথাটি অবশ্য মান্য করেন যে, শক্তি এবং শক্তিমানের মধ্যে ভেদ থাকিয়াও ভেদ নাই, আর, সেই সঙ্গে ইহাও বোধ হয় তিনি জানেন যে, ভেদ থাকিয়াও ভেদ নাই—এ কথাটি বাক্যে সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করিয়া বুঝানো যায় না বলিয়া শাস্ত্রকারেরা শক্তির নাম দিয়াছেন "অব্যপদেশ্য"। অব্যপদেশ্যের একটি স্থূল দৃষ্টান্ত দিতেছি; একটা কাচের পাত্রে তেল আর জল একত্রে স্থাপন করিলে উভয়ের সন্ধিস্থলে একটি চক্রাকৃতি রেখা সকলেরই প্রত্যক্ষগোচর হয়। কিন্তু সে রেখাটিকে জলরেখা বলিব না তৈলরেখা বলিব? তেলের দিক্ দিয়া দেখিলে তাহা জল-রেখা নহে—তৈলরেখা; জলের দিক্ দিয়া দেখিলে তাহা তৈলরেখা নহে—জলরেখা; কোন্ কথা ঠিক্? চক্রাকৃতি রেখাটি যেমন তেল আর জলের মধ্যবর্ত্তী, কার্য্যোৎপাদিকা শক্তি তেমনি কার্য্য এবং কারণের মধ্যবর্ত্তী, এই জন্য তাহা কারণের সহিত অভিন্ন হইয়াও কারণ হইতে ভিন্ন। অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন—এ কথাটা মুখে বলিবার সময় স্ববিরোধী (suicidal) শুনায় অথচ উহার ভিতরে সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, ইহা দেখিয়া শাস্ত্রকারেরা শক্তিকে অব্যপদেশ্য বলিয়াছেন—"অব্যপদেশ্য" অর্থাৎ যাহা বলিয়া বুঝানো যায় না। অতএব ব্রহ্মেতে শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিলে তাঁহাতে ভেদ আরোপিত হয় না, কেননা শক্তি-শক্তিমানের মধ্যে কার্য্যের দিক্ দিয়া দেখিলে যেমন বিভেদ, কারণের দিক্ দিয়া দেখিলে তেমনি অভেদ। "শক্তি শক্তিমতোরভেদঃ"।

আমি বলি এই যে, ঈশ্বর অখণ্ড অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ভেদ-বর্জ্জিত এটা যেমন সত্য—সেই সঙ্গে এটাও তেমনি সত্য যে, ভেদ প্রকটন করিবার শক্তি ঈশ্বরেতে আছে। ঈশ্বরের সেই অনির্ব্বচনীয় শক্তিকেই অদ্বৈতবাদীরা মায়া বলেন, এবং কি অর্থে মায়া বলেন তাহা আমি বলিয়াছি—magical power এই অর্থে। অভেদ হইতে ভেদ উৎপন্ন করিবার শক্তি ঈশ্বরের আছে ইহার প্রমাণ দৃশ্যমান জগৎ এবং সমুদায় শাস্ত্র। ঈশ্বর হইতে ঈশ্বরের শক্তি বাদ দিলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব বিলোপ করা হয় এটা আমার নিজের ঘর-গড়া কথা নহে—এ কথা দর্শন পুরাণ তন্ত্র সকল শাস্ত্রই একবাক্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন। শাঙ্কর ভাষ্যে আছে—

"ন হি তয়া বিনা পরমেশ্বরস্য স্রষ্টৃত্বং সিদ্ধ্যতি,শক্তিরহিতস্য তস্য প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ"

শক্তি বিনা পরমেশ্বরের স্রষ্টৃত্ব সিদ্ধ হয় না—যেহেতু শক্তিরহিত ঈশ্বরের প্রবৃত্তি অসম্ভব। তন্ত্রে তো স্পষ্টই রহিয়াছে যে,

"শক্তিং বিনা মহেশানি সদাহং শবরূপকঃ।
শক্তিযুক্তো যদা দেবি শিবোহহং সর্ব্বকামদঃ॥"

হে মহেশানি! শক্তি বিনা আমি শব-রূপী, যখন শক্তিযুক্ত হই তখনই আমি সর্ব্বকামপ্রদ শিব। শক্তি-হীন শিব যদি শব হইতে পারেন তবে কবিতা-শক্তি এবং মূর্খতা উভয়-বিহীন কালিদাস যে খালিদাস হইবেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সেই সঙ্গে আমি এ কথাও বলিতে পারিতাম যে, ধী-শক্তি-বিহীন

সংবিৎ সম্বিৎই নহে—তাহা সম্বিতের সং-মাত্র। হীরেন্দ্র বাবু matter এবং motion উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, শাস্ত্রের মতানুসারে motion পুরুষ, matter প্রকৃতি, কিন্তু এ যাবৎ আমি motion অর্থে অথবা force অর্থে পুরুষ শব্দের প্রয়োগ কোনো শাস্ত্রে কোথাও দেখি নাই! আমি যতদূর শাস্ত্রের ভাব জ্ঞানায়ত্ত করিতে পারিয়াছি তাহাতে আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, matter এবং motion রজোগুণ এবং তমোগুণেরই প্রতিরূপ। উভয়ই প্রকৃতির অঙ্গ; তা বই কোনো শাস্ত্রের মতেই পুরুষ matter এবং motion এর শ্রেণীভুক্ত নহে। হীরেন্দ্র বাবু পুরুষ এবং প্রকৃতির synthesis কে ব্রহ্ম বলেন কিন্তু শাঙ্কর ভাষ্যে বিষয়ী এবং বিষয়ের—আত্মা এবং জড়ের synthesis অধ্যাস বলিয়া উক্ত হইয়াছে, আর, অধ্যাসই অবিদ্যা এবং ভ্রমের উপাদান বলিয়া উক্ত হইয়াছে; শারীরক সূত্রভাষ্যের উপক্রমণিকা দেখিলেই তিনি আমার এই কথাটির তাৎপর্য্য অবগত হইবেন। সাংখ্য দর্শনের সৃষ্টি-প্রকরণে 'আকৃতি', এবং সাধন-প্রকরণে উপরঞ্জন, প্রকৃতি এবং পুরুষের synthesis বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। বেদান্তের অধ্যাস এবং সাংখ্যের উপরঞ্জন যদিচ বিভিন্ন অর্থ জ্ঞাপক কিন্তু দুইই synthesis—আত্মানাত্মার synthesis, আর, দুইই বিবেক (analysis) দ্বারা প্রতিহন্তব্য। সকল শাস্ত্রেই বলে পুরুষ matter এবং motion-এর অধ্যক্ষ; তা বই, ব্রহ্ম পুরুষ এবং প্রকৃতির synthesis এ ভাবের কথা কোনো শাস্ত্রে ঘুণাক্ষরেও দৃষ্ট হয় না—বরং উপনিষদে স্পষ্ট লিখিত রহিয়াছে যে, "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।" synthesis যদি বলিতে হয়, তবে শাস্ত্রের মতানুসারে প্রকৃতি সত্ত্ব রজো এবং তমো গুণের synthesis। সত্ত্ব রজো এবং তমোগুণকে enlightenment, motion এবং matter বলিয়া গ্রহণ করিলে শাস্ত্রের মর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে অব্যাহত থাকে। কিন্তু শাস্ত্রীয় বচনের এরূপ মুচড়াইয়া অর্থ করিবার বিশেষ কোনো আবশ্যকতা নাই।

হীরেন্দ্র বাবু একটি কথা যাহা বলিয়াছেন যে, পাতঞ্জলের মতে আত্মার স্বরূপে অবস্থানই যোগের চরম লক্ষ্য—এ কথা সত্য। কিন্তু সে চরম কথাটি কৈবল্য এবং মুক্তি বিষয়ের কথা। মুক্তি বিষয়ক একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ না লিখিয়া সে কথার মীমাংসা সংক্ষেপে হইতে পারে না। যোগ-শাস্ত্রের মতানুসারে সাধন-দ্বারা জীব যখন প্রকৃতিকে সর্ব্বতোভাবে জয় করিয়া সর্ব্বজ্ঞ হয়, তখন প্রকৃতি আপনা হইতেই অবসৃত হয়—প্রকৃতি অবসৃত হইলে জীব কৈবল্য লাভ করে। কিন্তু সচরাচর সকল লোকের এবং আমারও এটা ধ্রুব বিশ্বাস যে, জীব কখনও সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না; আর সর্ব্বজ্ঞ হইলেই যে প্রকৃতির সহিত যোগচ্যুত হইতে হইবে তাহারও কোনো কারণ দেখা যায় না—কেন না ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ অথচ তিনি প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা এবং নিয়ন্তা। এ-সকল কৈবল্য-সম্বন্ধীয় কথার উপরে আমার অনেক কথা বলিবার আছে—অপ্রাসঙ্গিকতা এবং বাহুল্য ভয়ে আমি সে-সকল কথা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করা শ্রেয় বোধ করি নাই। হীরেন্দ্রনাথ বাবু যাহা যাহা বলিয়াছেন সেই সকল কথার ভিতরে তিনি যদি ভাল করিয়া আর একটু তলাইয়া দেখিতেন তাহা হইলে তিনি আমার সহিত অতটা মত-ভেদ প্রকাশ করিতেন না; সত্য-সত্যই যেখানে মত-ভেদ আছে সেই

স্থানে আমি যেরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছি তাহার সত্যাসত্য বিচার করিতেন।

মহামান্য সভাপতি মহাশয় (শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) সর্ব্বশেষে একটি অতি গুরুতর কথা ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। তাহা এই যে, ঈশ্বরেতে সৃষ্টি পূর্ব্বে বিলীন ছিল এটা যখন স্থির, তখন পরেও বিলীন হইবে ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, খ্রীষ্টানদিগের বাইবেলের মতে একবার মাত্র সৃষ্টি হইয়াছিল এবং একবার মাত্র প্রলয় ভবিতব্য, কিন্তু আমাদের দেশীয় শাস্ত্রকারদিগের মতানুসারে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ভূয়োভূয় হইয়াছে এবং ভূয়োভূয় হইবে। আমরা যখন ইতিহাস-গ্রন্থে কোনো মনুষ্যের জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করি, তখন তাহাতে তাঁহার নিদ্রাকালের কোনো কথার উল্লেখ নাই বলিয়া আমরা গ্রন্থকারকে দোষ দিই না। গ্রন্থকার যে কারণে প্রসঙ্গিত ব্যক্তির নিদ্রাবস্থার কোনো বৃত্তান্ত উল্লেখ করেন না, আমিও সেই কারণে জগতের প্রলয়ের কোনো কথা উল্লেখ করি নাই। গুরুদাস বাবু যদি আমাকে বলেন যে তাঁহার এক-জন শিষ্যের দিন দিন জ্ঞানোন্নতি হইতেছে, আর, তাহার প্রত্যুত্তরে আমি যদি তাঁহাকে বলি যে, প্রতি রাত্রিতে যে ব্যক্তি শিশুর ন্যায় অজ্ঞান হইয়া নিদ্রা যায়, তাহার আবার জ্ঞানোন্নতি কিরূপ? তবে, এ কথা শুনিয়া গুরুদাস বাবু হাস্য করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নিদ্রা কিছু আর জীবনের চরম উদ্দেশ্য নহে—নিদ্রা কেবল জাগ্রৎকালের চেতনকে শানিত করিবার জন্যই হইয়াছে। সৃষ্টির উপকারের জন্য প্রলয় হইয়াছে, প্রলয়ের উদর-পূরণের জন্য সৃষ্টি হয় নাই। যদি নিদ্রা জীবের চরম উদ্দেশ্য হইত, তবে মাতৃগর্ব্ভের অন্ধকার হইতে বাহির হইবার তাহার কোনো আবশ্যকতা ছিল না। প্রলয় সমস্ত জগতের নিদ্রা—সেই নিদ্রা-হইতে (ঈশ্বরের আরোগ্যদায়ী সর্ব্বমঙ্গলাকর মাতৃ-ক্রোড় হইতে) জগৎ যখন নবীভূত হইয়া গাত্রোত্থান করে, তখন জগৎ পূর্ব্বার্জ্জিত উন্নতি হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া পুনর্ব্বার উন্নতি-পথে দিন দিন অগ্রসর হইতে থাকে;—কোনো কালেই উন্নতি-প্রবাহের তানভঙ্গ হয় না। নিদ্রাও বালকের শ্রমার্জ্জিত বিদ্যাবুদ্ধি হরণ করে—আর, ধোপাও গৃহস্থের বহুমূল্য বস্ত্র সকল মোট বাঁধিয়া লইয়া যায়; ধোপাও বস্ত্র-গুলা পরিষ্কৃত করিয়া ফিরাইয়া দেয়, নিদ্রাও বিদ্যা বুদ্ধিকে নবীভূত করিয়া ফিরাইয়া দেয়। নিদ্রাও বালকের উন্নতির বিঘ্নকারী নহে—প্রলয়ও জগতের উন্নতির বিঘ্নকারী নহে; প্রত্যুত দুইই উন্নতির পরম সহায়। অতএব শ্রদ্ধেয় গুরুদাস বাবু এই যে বলিয়াছেন—যে, জগৎ ঈশ্বরে বিলীন হওয়া অথবা (যাহা একই কথা) জগতের প্রলয় উপস্থিত হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে, সে কথাটা সত্য হইলেও তাহা আমার অভিপ্রেত চিরোন্নতিবাদের অনুকূল বই প্রতিকূল নহে।

গুরুদাস বাবু আমার একটি কথার অতীব একটি পরিষ্কার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছিলেন—তজ্জন্য তাঁহাকে আমি ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। আমি বলিয়াছি যে, দৃশ্যমান জগৎ চক্ষে যেরূপ প্রতিভাত হয়—স্বরূপতঃ তাহা সেরূপ নহে, কেবল এই কথাটি জানিলে অবিদ্যা ঘুচিয়া যায় বটে কিন্তু বিদ্যার আয়-বৃদ্ধি হয় না। আমরা সকলেই পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছি যে, দেয়াল আমাদের

চক্ষে যেরূপ স্থূল পদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, বাস্তবিক তাহা সেরূপ নহে; সে বিষয়ে আমাদের সকলেরই অবিদ্যা অনেক কাল ঘুচিয়া গিয়াছে; কিন্তু দেয়ালের অভ্যন্তরে প্রাকৃতিক শক্তি কিরূপে কার্য্য করিতেছে সে বিদ্যা আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেরই আছে। সেই সকল বিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কত যে আশ্চর্য্য তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়, তাহার উদাহরণ-স্বরূপে গুরুদাস বাবু বলিলেন যে, তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন—বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া বিশেষের গুণে দেয়ালের ন্যায় দৃষ্টিরোধী বস্তু কাচের ন্যায় স্বচ্ছ মূর্ত্তি ধারণ করিল। তাহা ব্যতীত অধুনাতন কালে মানসিক প্রকৃতি সম্বন্ধেও বিদ্যার যে কত উন্নতি হইতেছে—তাহার দৃষ্টান্ত স্থলে হীরেন্দ্র বাবু Hypnotism এর উল্লেখ করিয়াছিলেন। Hypnotism যে সবই সত্য তাহা নহে, আর তাহার মধ্যে সত্য কিছুই নাই তাহাও নহে;—Hypnotism সম্বন্ধে এক্ষণে বিজ্ঞান-মহলে পরীক্ষা চলিতেছে—চরম সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। যাহাই হউক্—suggestion প্রভৃতি মানসিক শক্তির কার্য্য-কারিতা জানিতে পারিলে তাহাতে বিদ্যার আয় বৃদ্ধি হয়, এ কথা আমিও অস্বীকার করি নাই—আর,কেহ যে অস্বীকার করিবেন তাহার সম্ভাবনাও নাই। আমি উল্টা আরো এই কথা বলি যে, মিথ্যা মায়া বোধে জগৎকে তুচ্ছ না করিয়া জগতের মধ্যে মানসিক এবং ভৌতিক প্রকৃতি, এক কথায়—ঐশী শক্তি, কিরূপ কার্য্য করিতেছে তাহা জ্ঞাত হইয়া জ্ঞানের আয়-বৃদ্ধি করা অতীব আবশ্যক। অর্থাৎ Hypnotism এর মধ্যে কিরূপ সত্য আছে তাহা জানাও আবশ্যক, আর, আলোক-তত্ত্বের মধ্যে কিরূপ সত্য আছে তাহা জানাও আবশ্যক—মায়া-বোধে কাহাকেও অগ্রাহ্য করা উচিত নহে।

আমার বক্তব্য অনেক কথা আমি সাঁটে-ষোঁটে বলিয়াছি, আপনারাও তাহা সাঁটে-সোঁটে বুঝিয়া লইবেন—ইংরাজিতে প্রবাদই আছে a word to the wise is sufficiert বিজ্ঞ জনের প্রতি এক কথাই যথেষ্ট।

রামাবতারের অভিব্যক্তি।

২২ শ প্রস্তাব।

যুদ্ধকাণ্ড।

আমরা গতবারের প্রস্তাবে যুদ্ধকাণ্ডের আদিত্য-হৃদয়াত্মক ১০৬তম সর্গ যে প্রক্ষিপ্ত বলিয়াছি তাহার কারণ এই যে, ইহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক। ১০৬ সর্গের ভাষা বাল্মীকির ভাষা নহে, নব্য পুরাণের ভাষা। রাবণ যুদ্ধার্থ ক্ষণকাল মধ্যে রামের পুরোবর্ত্তী হইলেন, রামও মাতলিকে প্রস্তুত হইতে বলিলেন, ইহার মধ্যে সময়ের এত ব্যবধান কোথা যে আদিত্য হৃদয় স্তব শ্রবণ করিতে রামচন্দ্র অবকাশ পাইবেন। বিশেষতঃ মহর্ষি বাল্মীকি রামের নৈতিক জীবনের জ্বলন্ত চিত্র দেখাইতে প্রয়াসী হইলেও নিজে প্রকারান্তরে তাঁহার ধর্ম্মমত বা ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিচয় দিতে বড়ই কাতর। অথবা তিনি কাব্য লিখিতেছেন, বিশেষ কোন ধর্ম্মমত লইয়া জল্পনা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। তিনি রামচন্দ্রের শৌর্য্য বীর্য্য বর্ণনায় বিভোর, রামচন্দ্র যে দৈবশক্তি বা মন্ত্রশক্তি প্রভাবে রাবণ বধ করিবেন, এক কথা কবির সহিবে কেন, তাই কবিচূড়ামণি, রামচন্দ্রের অপরিচ্ছিন্ন ও নৈসর্গিক অমিত তেজেরই বিশেষ পক্ষপাতী; রাবণ বধে কবির ঐ উদ্দেশ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। রামের শক্তি

দৈববলে যে পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল তাহার পরিচয় তিনি স্বকীয় অমূল্য কাব্যে কোথাও দেন নাই। যেখানেই তাহার আভাস পাইব, বুঝিতে হইবে যে সেখানে রচনার মৌলিকত্বের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। পরবর্ত্তী পুরাণলেখকেরা ঠিক এই স্থলে রাবণ কর্ত্তৃক দুর্গাপূজার সন্নিবেশ করিয়াছেন।

আমরা পরবর্ত্তী সর্গের প্রথম আটটি শ্লোকের মৌলিকত্ব সম্বন্ধে যে সন্দেহ করিয়াছিলাম, তাহার বিশিষ্ট কারণ এই যে রাবণ প্রথমে যে রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ বাহির হয়েন, ১০৩ সর্গের প্রথমেই তাহা পরিত্যাগ করিয়া রথান্তর গ্রহণে রামের সহিত সংগ্রাম করেন। এরূপ অবস্থায় একাদিক্রমে ৪ চারি সর্গ বাদে অর্থাৎ ১০৭ সর্গে ঐ শেষোক্ত রথের বর্ণনা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে। বিশেষতঃ ঐ কয়েকটি শ্লোকে রথের যে কয়েকটি বিশেষণ আছে তাহা আদৌ সমীচীন বা বাল্মীকির অনুরূপ বলিয়া বোধ হয় না।

সে যাহা হউক রাম রাবণে ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হইল। রাবণ কিছুতেই বিনষ্ট হন না। রাম একটি মস্তক খণ্ডন করেন আর একটি উত্থিত হয়। রাম এইরূপে ক্রমান্বয়ে শত মস্তক খণ্ডন করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু কিছুতেই ফলোদয় হইল না। পরিশেষে অবসর বুঝিয়া রামচন্দ্র ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। উহা মহাবেগে রাবণের বক্ষ বিদারণ করিল। রাবণ রক্তাক্ত দেহে ভূমে বিলুণ্ঠিত হইলেন, তাঁহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। (এখানে ইহা উল্লেখ যোগ্য যে দশকণ্ঠ প্রভৃতি রাবণের যে সমস্ত বিশেষণ আছে, তাহা আর কিছুই নহে, রাবণ যুদ্ধে দশ দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া যুদ্ধ করিতেন তাই ঐরূপ বিশেষণের সার্থকতা। যাঁহারা রামায়ণ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন যে সত্য সত্য রামের দশ মুণ্ড বা বিংশতি বাহু ছিল না, যুদ্ধের সময়েই কেবল ঐরূপ বর্ণনা আছে, অন্যত্র নহে)।

রাবণবধ শ্রবণে মন্দোদরী প্রমুখ মহিষীরা সমরক্ষেত্রে আসিয়া বিলাপ ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাম তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে রাক্ষস ব্রাহ্মণেরা আসিয়া রাবণকে পট্টবস্ত্র পরিধান করাইয়া শিবিকায় আরোহণ করাইল ও বেদোক্ত বিধানে তাঁহার অগ্নিক্রিয়া সমাপন করিল। বিভীষণ লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন ও সীতাকে আনিবার জন্য হনুমান প্রেরিত হইলেন।

রাক্ষসদিগের মধ্যে সভ্যতা রণকৌশল শিল্পচাতুর্য্য প্রভৃতির যে সমস্ত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, যে রাক্ষসেরা বৌদ্ধগণের নামান্তর মাত্র। তাহারা যাজ্ঞিক ক্রিয়াকলাপের বিঘ্নকারী হইলেও তাহাদের মধ্যে বেদাদি শাস্ত্রের আলোচনার বা আর্য্যজাতির অনুরূপ গৃহ্যঅনুষ্ঠানের অভাব ছিল না। তবে তাহারা বা তৎসদৃশ অন্য কোন সম্প্রদায় ধর্ম্মমতের অনৈক্য নিবন্ধন বা বৈরিতা বশত আপনাদিগকে নিন্দনীয় ও ঘৃণার্হ করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা আর্য্যজাতির সহিত সকল সম্বন্ধ তিরোহিত করিয়া দিয়া শত্রুভাবে দূর দূরান্তরে ভারতের দক্ষিণ প্রদেশে আপনাদের প্রভাব ও রাজত্ব বিস্তার করিয়াছিল। ইহারই জন্য তাহারা আর্য্য কবিগণের হস্তে বিদ্রূপাত্মক চিত্রে অঙ্কিত ও নরমাংসভোজনাদি ঘৃণাকর আচরণ

তাহাদের স্কন্ধে আরোপিত। বিশেষতঃ এ দেশীয় কবিগণের প্রকৃতিগত অতিরঞ্জন বৈরীভাবের সহিত মিলিত হইয়া রাক্ষসমূর্ত্তিকে আরও ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছে। ইতিহাসের সেই অতীত যুগের ত দূরের কথা, কৌশলী বিদেশীয় ইতিহাস-লেখকগণের হস্তে পড়িয়া বিগত শতাব্দীর বঙ্গের নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে নৃশংসমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কি লাঞ্ছনা না ভোগ করিতে হইতেছে।

যাঁহারা এরূপ আশঙ্কা করেন যে রাক্ষসগণকে বৌদ্ধ স্বীকার করিলে রাম-রাবণ-ঘটিত বৃত্তান্ত আধুনিক হইয়া পড়ে, তাঁহাদিগকে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি, যে শাক্যসিংহ জন্মিবার বহুপূর্ব্ব হইতেও যাগযজ্ঞবিরোধী এক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। যেমন চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্ব হইতে শ্রীমদ্ভাগবৎমূলক বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিদ্যমান ছিল, চৈতন্যদেব তাহা নূতন আকারে প্রচার করিয়াছিলেন, তেমনি বুদ্ধদেব জন্মিবার পূর্ব্ব হইতে যজ্ঞদ্বেষী এই সম্প্রদায় ছিল, বুদ্ধদেব তাহাকে নূতন অঙ্গসৌষ্ঠব দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নামে এই ধর্ম্মের নামকরণ। শাক্যসিংহের পূর্ব্বেও যে বৌদ্ধ ছিল, বলাবাহুল্য যে তাহার প্রমাণের অল্পতা নাই।

সে যাহা হউক সীতা হনূমানমুখে রাবণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে আনন্দিত হইয়া কহিলেন, আমি ভর্ত্তাকে দেখিতে ইচ্ছা করি। বিভীষণের অনুরোধে সীতা স্নানান্তে বস্ত্র-অলঙ্কার পরিধান করিয়া শিবিকা যোগে রামের নিকটে আসিলেন। বিভীষণ তত্রত্য সমস্ত লোককে অপসারিত করিবার আদেশ দিলে রাম তাঁহাকে কহিলেন, কেন তুমি আমায় উপেক্ষা করিয়া এই সমস্ত লোককে কষ্ট দাও। ইহারা আমারই আত্মীয় স্বজন। গৃহ বস্ত্র প্রাকার স্ত্রীলোকের আবরণ নহে, এইরূপ লোকাপসারণও স্ত্রীলোকের আবরণ নহে, ইহা রাজাড়ম্বর মাত্র। চরিত্রই স্ত্রীলোকের আবরণ। বিশেষতঃ বিপত্তি পীড়া যুদ্ধ স্বয়ংবর যজ্ঞ ও বিবাহকালে স্ত্রীলোককে দেখিতে পাওয়া দূষণীয় নহে। সীতা বিপন্না, তিনি শিবিকা ত্যাগ করিয়া পদব্রজেই আসুন। এই সমস্ত বানর আমার সমীপে তাঁহাকে দেখুক। জানকী তাহাই করিলেন ও লজ্জায় যেন স্বদেহে মিশাইয়া যাইতে লাগিলেন।

এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে ভদ্রবংশের স্ত্রীলোকেরা রামায়ণের সময়েও বিশেষ কারণ ভিন্ন পর পুরুষের দৃষ্টির সমক্ষে বড় বাহির হইতেন না।

রাম বিনয়াবনত জানকীকে পার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখিয়া কহিলেন, ভদ্রে! আমি শত্রু জয় করিয়া তোমাকে আনিলাম, পৌরুষে যত দূর হয় তাহা করিলাম। চপলচিত্ত রাক্ষসেরা যে তোমাকে অপহরণ করিয়াছিল, ইহা তোমার দৈববিহিত দোষ, আমি মনুষ্য হইয়া তাহা ক্ষালন করিলাম। আমি স্বীয় চরিত্ররক্ষা সর্ব্বব্যাপী নিন্দাপরিহার এবং আপনার প্রখ্যাত বংশের নীচত্বঅপবাদ দূরীকরণের উদ্দেশে ইহা করিয়াছি। এক্ষণে রাবণগৃহবাসনিবন্ধন তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ জন্মিয়াছে। আমি আর তোমাকে চাহি না। তুমি যদৃচ্ছা গমন কর।

সীতা ইহা শুনিয়া নিতান্ত ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইয়া কহিলেন, তুমি বিচারক্ষম হইয়াও আমার বহুমানযোগ্য চরিত্র বুঝিলে না, এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে লক্ষ্মণকে কহিলেন, তুমি চিতা প্রস্তুত করিয়া দাও, আমি মিথ্যা অপবাদ

শুনিয়া বাঁচিতে চাহি না, ভর্ত্তা আমার গুণে অপ্রীত, আমি অগ্নি প্রবেশ করিয়া দেহপাত করি।

লক্ষ্মণ রোষবশে রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং আকার প্রকারে তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া চিতা রচনা করিয়া দিলেন। সীতা রামকে প্রদক্ষিণ ও ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক অগ্নিসমক্ষে কহিলেন, যদি রামের প্রতি আমার মন অটল থাকে, তবে এই লোকসাক্ষী অগ্নি আমায় রক্ষা করুন, এই বলিয়া যজ্ঞে পূর্ণাহুতির ন্যায় অগ্নিতে নিপতিত হইলেন। রাক্ষস ও ব্রাহ্মণেরা ইহা দেখিয়া তুমুল রবে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। ১১৮ সর্গ। মুহূর্ত্তকালমধ্যে মূর্ত্তিমান অগ্নি জানকীকে অঙ্কে লইয়া চিতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থিত হইলেন এবং রামের হস্তে সীতাকে সমর্পণ পূর্ব্বক কহিলেন, রাম! এই তোমার জানকী, ইনি নিষ্পাপা। রাম ইহা শুনিয়া জানকীকে গ্রহণ করিলেন ও সকলে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল। ১২০ সর্গ। ১১৯ সর্গে একটু রহস্য আছে। সীতা চিতায় প্রবেশ করিলে কুবের, পিতৃগণের সহিত যম, ইন্দ্র, বরুণ, মহাদেব, ব্রহ্মা উজ্জ্বল বিমানযোগে রামের সমীপে উপনীত হইয়া কহিলেন, কেন তুমি জানকীর অগ্নিপ্রবেশে উপেক্ষা কর; তুমি ত্রিলোকের আদিকর্ত্তা, তোমার কেহ নিয়ন্তা নাই, তুমি আদ্যন্তমধ্যে বর্ত্তমান। রাম তাহা শুনিয়া উত্তর করিলেন, আমি রাজা দশরথের পুত্র, 'আমি আপনাকে মনুষ্য বোধ করিয়া থাকি'; এক্ষণে আমি কে এবং আমার স্বরূপই বা কি আপনারা তাহাই বলুন। ব্রহ্মা কহিলেন তুমি নারায়ণ, তুমি জন্মমৃত্যুবিরহিত নিত্য অব্যয় সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম, তুমি ওঁকার পরাৎপর সর্ব্বব্যাপী। তুমি রাবণকে বধ করিবার জন্য মনুষ্য-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ। এক্ষণে আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে, রাবণ বিনষ্ট হইয়াছে, অতঃপর তুমি হৃষ্টমনে দেবলোকে চল।

পাঠকবর্গ নিবিষ্ট-চিত্তে দেখিবেন যে কেমন কৌশল এখানে খাটান হইয়াছে। রাম যে মূল রামায়ণে আপনাকে বহুস্থলে মনুষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তাহা খণ্ডনের জন্য এখানে দেবগণের সমাগম হইল। তাঁহারা সমস্বরে বলিলেন, রাম স্বয়ং নারায়ণ। কিন্তু আমরা এখানে এইটুকু পাইলাম যে রাম ইহার পূর্ব্বে আপনাকে স্বয়ং বিষ্ণু বলিয়া কিছুই জানিতেন না, মনুষ্য বলিয়াই তাঁহার ধারণা ছিল। যদি তাহাই হয়, তবে যুদ্ধকাণ্ডের এই ১১৯ সর্গের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কাণ্ডে বা কোন সর্গে রাম আপনাকে দেবতা বলিয়া অভিমান করিয়া থাকিলে, তৎসমুদয় অবশ্যই অমূলক বা প্রক্ষিপ্ত। হয় রাম বা তাঁহার ভ্রাতা লক্ষ্মণ আপনাদিগকে অন্যায়ত দেবতা বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, না হয় (রামাদির পক্ষে মিথ্যাকথন অসম্ভব বিধায়) তৎসমুদয় পরবর্ত্তী লেখক কর্ত্তৃক রচিত ও সংযোজিত হইয়া রামায়ণে স্থান পাইয়াছে।

রামচন্দ্রকে দেবগণমুখে স্বয়ং বিষ্ণু বলাইলেও গোলযোগের শান্তি হয় না। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, যে বাল্মীকি নারদকে আদি কাণ্ডের প্রথম সর্গে একজন আদর্শ মনুষ্যের বিষয় বিবৃত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। নারদও সতর্ক হইয়া বলিয়াছিলেন যে বাল্মীকি কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত গুণগুলি মনুষ্যে সুলভ নহে, তবে একজন মনুষ্যের বিষয়

তিনি অবগত আছেন, যিনি ঐসকল গুণের আধার। এই বলিয়া তিনি রামচরিত বলিয়া চলিলেন। অন্ততঃ নারদের ইহা ঠিক ছিল তিনি মনুষ্যের কথাই বলিতেছেন, মনুষ্যের কথাই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। কিন্তু বলিতে বলিতে আখ্যায়িকাকার যদি আখ্যায়িকার শেষ ভাগে বলিয়া বসেন, যে তিনি কিন্তু মনুষ্য নহেন, দেবতা—স্বয়ং বিষ্ণু, তবে আগায় গলদ দাঁড়াইয়া যায়। এবং রামায়ণ হইতে আমরা যে ভাবে দেখাইয়া আসিতেছি তাহাতে আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি যে রামকে এখানে বিষ্ণুরূপী খাড়া করা ইচ্ছাকৃত গলদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাঁহাকে দেবতা বলা হইতেছে, তিনি তাহা আদৌ অবগত নহেন, অথচ সকলে মিলিয়া তাঁহার দেবত্ব কীর্ত্তন করিতেছে, ব্যাপার মন্দ নহে !

বহুকাল পরে সীতাকে দেখিয়া,আমরা মনে করিয়াছিলাম, যে রাম কত না অধীর হইয়া পড়িবেন এবং কতই না আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিবেন। কিন্তু রামের চরিত্র ইতর সাধারণ অপেক্ষা যে কত উচ্চ এখানে তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। তিনি নিজে রাজপুত্র, রঘুবংশে তাঁহার জন্ম, তিনি আপনার ঐহিক সুখ-সম্পত্তির নিকটে বংশগত মানমর্য্যাদা বলিদান দিবার লোক নহেন। তাঁহার ভবিষ্যত দৃষ্টি প্রখর। গুরু বিপদও তাঁহাকে মুহ্যমান করিতে পারে না, সুমহান আনন্দও তাঁহাকে দিশাহারা করিতে সক্ষম নহে। এত সাধনলব্ধ প্রেমের প্রতিমা সীতা তাঁহার সম্মুখে, অথচ রাম তাঁহার প্রতি উদাসীন। লক্ষ্মণ রামের আচরণ দেখিয়া মর্ম্মাহত, অথচ হিমাচলসম গাম্ভীর্য্যের প্রতিকূলে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতেও কুণ্ঠিত, এমন কি রামের অভিপ্রায় অনুসারে সীতার চিতারচনা করিতেও উদ্যত। রাম অবনতদৃষ্টি, সীতা তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্নি প্রবেশ করিতেছেন। কি, জ্বলন্ত মর্ম্মস্পর্শী চিত্র! বলিতে কি পৌরাণিকগণ ঠিক আদর্শ মনুষ্য বুঝিয়া রামকে অবতারত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। আমাদের বিবেচনায় যদি জীবন দেখিয়া কাহাকেও আদর্শ মনুষ্য বলিতে হয়, তবে তাহা এক রামচন্দ্র। যদি গীতা ও মোটামোটি জীবন দেখিয়া উনবিংশতি শতাব্দীর দৃষ্টিতে কাহাকে আদর্শ পুরুষ বলিতে হয় তবে তাহা শ্রীকৃষ্ণ। তবে কৌশলী কূটনীতিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণের জীবনী পরবর্ত্তী লেখকের হস্তে কলুষিত। কিন্তু রামের আদর্শজীবন এমনই উৎকৃষ্ট উপাদানে গ্রথিত, যে তাহা কোন কালে ম্লান হইবার নহে, বরং চিরকালই মহিমান্বিত থাকিয়া ভারতের প্রত্যেক নরনারীর জীবনের উপর মধুর স্তিমিত আলোক বর্ষণ করিতে থাকিবে ও অজ্ঞাতসারে তাহাদের জীবনকে ক্রমিকই উন্নত ও পবিত্র করিয়া তুলিবে।

এদিকে ১২১ সর্গে মহাদেব আসিয়া রামকে বলিলেন তুমি অযোধ্যায় গিয়া রাজ্যগ্রহণ কর। ঐ দেখ তোমার পিতা দশরথ বিমানযোগে মর্ত্ত্যে আসিয়াছেন। রাম ও লক্ষ্মণ বিমানস্থ পিতাকে প্রণাম করিলেন; পিতাও তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া বিদায় হইলেন। ১২২ সর্গে ইন্দ্র আসিয়া রামকে কহিলেন আমরা তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। রাম কহিলেন, যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন,তবে রণে বিনষ্ট বানরগণ বাঁচিয়া উঠুক। ইন্দ্র বরপ্রদান করিলেন, মৃত বানরেরাও অক্ষত দেহে গাত্রোত্থান করিল। ১২৩ সর্গে রাম

অযোধ্যায় যাইতে উৎকণ্ঠিত হইলে বিভীষণ কহিলেন, কুবেরের পুষ্পক রথ যাহা রাবণ অধিকার করিয়াছিল, তাহা কামগামী, আপনি ঐ রথে একদিনেই অযোধ্যায় পৌঁছিতে পারিবেন। রথ আনীত হইল, রাম ও লক্ষ্মণ ঐ দিব্য রথ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ও পরবর্ত্তী সর্গে বিভীষণকে কহিলেন তুমি বানরগণের সাহায্যে লঙ্কাজয় করিয়াছ, তুমি কৃতজ্ঞতার সহিত ধনরত্ন দিয়া ইহাদিগের রণশ্রম সফল কর। বিভীষণ তাহাই করিলেন। সুগ্রীব কিষ্কিন্ধায় প্রতিনিবৃত্ত হইবার আদেশ পাইল। কিন্তু সুগ্রীবাদি বানরগণ ও বিভীষণ অযোধ্যায় গিয়া রামের অভিষেক দর্শনে উৎসুক হইলে রাম অমাত্য সহ বিভীষণ ও বানরগণকে লইয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রথে আরোহণ করিলেন। বিমান আকাশ পথে উঠিল।

রাম এক এক করিয়া সীতাকে যুদ্ধভূমি, সেতুবন্ধন, কিষ্কিন্ধাপুরী দেখাইয়া চলিলেন। সীতা সুগ্রীবের প্রিয়-ভার্য্যা তারা ও অন্যান্য বানরপত্নীকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে রাম স্বীকৃত হইলেন, ও তাহারা সকলে বিমানে স্থান পাইল। ১২৬ সর্গে তাঁহারা ভরদ্বাজের আশ্রমে আসিয়া উপনীত হইলে, রাম মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভরতের বুদ্ধি ও চেষ্টা জানিবার জন্য হনুমানকে অগ্রে অযোধ্যায় প্রেরণ করিলেন। হনুমান অযোধ্যার ক্রোশমাত্র ব্যবধানে চীরচর্ম্মচারী ভরতকে আশ্রম মধ্যে দেখিতে পাইলেন। আরও দেখিলেন শুদ্ধস্বভাব অমাত্যেরা পুরোহিতগণ ও সৈন্যাধ্যক্ষেরা কাষায় বস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক উপবিষ্ট। হনুমানের মুখে রামের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে ভরত হর্ষে সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে গাত্রোত্থান করিয়া হনুমানমুখে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিলেন, এবং অযোধ্যা নগরীকে অলঙ্কৃত করিবার জন্য শত্রুঘ্নকে আদেশ দিলেন।

পরদিন রামের অনুজ্ঞায় হংস-শোভিত বেগবান বিমান ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইল। রাম উহাতে ভরতকে উঠাইয়া লইলেন। ভরত সকলকে অভিনন্দন ও বন্দনা করিয়া সেই পাদুকা দুখানি রামের পদে পরাইয়া দিয়া কহিলেন, আপনি যে রাজ্য ন্যাসস্বরূপ আমার হস্তে দিয়াছিলেন তাহা আপনাকে অর্পণ করিলাম। ভ্রাতৃবৎসল ভরতের সে কথা শুনিয়া বানরগণ ও বিভীষণ অশ্রুপাত করিতে লাগিল। রাম হর্ষে ভরতকে ক্রোড়ে লইলেন। তাঁহারা সকলে অযোধ্যাপুরীতে সমাগত হইলে রামের অভিষেকের উদ্যোগ হইল। সকল উপকরণ সংগৃহীত হইল। ব্রাহ্মণ বানর ও রাক্ষসগণ বস্ত্র ও অলঙ্কারে সমাদৃত হইয়া অভিষেক দর্শনান্তে নিজ নিজ স্থানে ফিরিয়া চলিল। রাম রাজা হইয়া ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং পৌণ্ডরীক ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ বারংবার অনুষ্ঠান করিলেন। তিনি দশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করেন, (সহস্র শব্দ যে বহুবাচীমাত্র তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি।) এবং পুত্র ভ্রাতা বান্ধবগণের সহিত অনেকবার নানা বিধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। তাঁহার রাজত্ব কালে কোনরূপ উপদ্রব দস্যুভয় বা অকালমৃত্যু ছিল না। প্রজারা ধর্ম্মপরায়ণ ছিল।

এই খানেই বাল্মীকি রামায়ণ সমাপ্ত হইল। অধ্যাত্ম রামায়ণের সহিত এই যুদ্ধকাণ্ডের বৈসাদৃশ্য দেখাইয়া আমরা পরে প্রমাণ করিব যে উত্তরকাণ্ড আদৌ

বাল্মীকির লিখিত নহে। কোন নিপুণ হস্তে ঐ কাণ্ড রচিত ও পরে সংযোজিত হইয়া সপ্তমকাণ্ড বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে।*

বেদ।

রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমি পূর্ব্বতন সময়ে জগন্মান্যা ছিল। প্রাচীন ভারত বিশ্বোজ্জ্বল রত্ন সমূহ প্রসব করিয়া স্বীয় রত্নগর্ভা নামের সার্থকতা বিধান করিয়াছে। ভারতীয় আর্য্য-বংশধরগণ অপূর্ব্ব তর্কশক্তি, অগাধ শাস্ত্র-জ্ঞান এবং অলোকসামান্য বুদ্ধি-মহিমা বিকাশ করিয়া ভূমণ্ডলস্থ তাবৎ জাতিকে একদা অধঃকৃত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে যখন প্রায় সমুদয় পৃথিবী অজ্ঞতার ঘোরা অমানিশায় আচ্ছন্ন ছিল, তখনও ভারত বিদ্যা ও সভ্যতার বিমল রশ্মিজাল বিকীর্ণ করিয়া চতুর্দ্দিক প্রভাময় করিয়া তুলিয়াছিল। প্রতিচী সভ্যতার উপদেষ্টা রোম ও গ্রীস সাম্রাজ্য যখন অনাগত কাল গর্ভে নিহিত ছিল, সে সময়েও ভারত ব্যাসাসন অধিকার পুরঃসর জগতকে বিবিধ জ্ঞান বিজ্ঞানে দীক্ষিত করিয়াছিল। তীক্ষ্ণ-মনীষা-সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ আদিম কালে যে সমস্ত মত উদ্ভাবিত করিয়া গিয়াছেন, অদ্যাপিও ইউরোপীয় বুধমণ্ডলী, মধুচক্র-পার্শ্বে মধুপগণের ন্যায়, সেই সকল তত্ত্বের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন মাত্র। পঞ্চনদের সলিল-সুস্নিগ্ধ পুলিন-প্রদেশে মহর্ষিগণ যে বেদগানে আর্য্যাবর্ত্তকে একদা সঙ্গীতময় সৌন্দর্য্যময় এবং স্বর্গময় করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই বেদের তুল্য প্রাচীন গ্রন্থ ভূমণ্ডলে আর দ্বিতীয় নাই। গ্রীস ও পারস্যদেশবাসী হোমার ও জোরাস্তা প্রণীত গ্রন্থাবলীও বেদের তুলনায় পরশ্ব মাত্র বিরচিত হইয়াছে। বেদ আর্য্য-ধর্ম্মের শিরোভাগ, আর্য্য-হৃদয়ের দর্পণ-স্বরূপ। ইহাতে ত্রিদিবের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য এবং গাম্ভীর্য্য একত্র অপূর্ব্ব ভাবে প্রতিভাত রহিয়াছে। ভারতবর্ষ যে একদা অত্যুন্নত-গৌরব-শিখরে অধিরোহণ করে, বেদানুশীলন তাহার প্রথম ও প্রধান কারণ। কিন্তু হায়! কালের কি বিস্ময়কর আবর্ত্তন, কি অচিন্ত্য শক্তি। যে ভারত-ভূমি স্বীয় অতুল মহিমাজ্যোতিতে অন্ধতমসাচ্ছন্ন পৃথিবীর অন্যান্য স্থানকে একদা উদ্ভাসিত করিয়াছিল, অদ্য সে অমাবস্যার গভীর তিমির-সাগর-নিমগ্ন। আজ তাহাকে আলোকের জন্য ইউরোপের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছে। যে আর্য্যজাতি এক সময়ে অপরিসীম সাহস ও অদম্য বিক্রম প্রকাশ করিয়া জগৎকে চমকিত ও ভূ-পৃষ্ঠে অক্ষয় বীরত্ব শৌর্য্য-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করেন, এক্ষণে সেই জাতি অম্লান বদনে অপরের পাদুকাভিঘাত সহ্য করিতেছেন—অবনত মস্তকে বিদেশীয়ের পদ-রজ ললাটে ধারণ করিয়া আপনাদিগকে সৌভাগ্যশালী ও পুণ্যবান বোধে স্ফীত-কণ্ঠ কপোতের ন্যায় সাহঙ্কার পদ-বিক্ষেপে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেছেন না। যাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী বিবিধ-বিষয়িণী বিদ্যার প্রিয়তম পুত্র বলিয়া ভূমণ্ডলে পরিচিত ছিলেন, অদ্য তাঁহারা হতমান হৃতসর্ব্বস্ব ও অনক্ষর হইয়া অসার ভারভূত যন্ত্রণাময় জীবন বহন করিতেছেন। সেই আর্য্য-জাতি কি এই আর্য্য-জাতি! প্রাংশু ও বামনে, বলী ও ক্ষীণে, সিংহ ও শিবায়, সমুদ্র ও কূপে, প্রভাকর ও খদ্যোতে যত বৈলক্ষণ্য, আদিম ও আধুনিক আর্য্য তদপেক্ষাও অধিক। ভারত এক্ষণে প্রমাদ-শয্যা-শায়িত। ভারত-শরীরে জাতীয় জীবন-স্রোত এক্ষণে রুদ্ধগতি; তাহার আকাঙ্ক্ষা নাই, আশা নাই, উদ্যম নাই, উৎসাহ নাই। আর্য্য-বংশধরগণের স্ব-ধর্ম্মে অনাস্থাই ইহার কারণ। বর্ত্তমান অসহনীয় জাড্যদোষও এইরূপ শোচনীয় অধঃপতনের কারণ।

বেদই আর্য্য-জাতির এক এবং অদ্বিতীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থ। সেই শুভ সময় ভারত ভাগ্যে কবে উপস্থিত হইবে, যখন হিমাচল হইতে সুদূর কন্যাকুমারিকা

---

* বর্ত্তমান প্রবন্ধে রাবণ কর্ত্তৃক দুর্গাপূজা না হইয়া রাম কর্ত্তৃক পঠিত হইবে।

পর্য্যন্ত নানা দর্শন-বিজ্ঞান-পূজিত, ঋষি-মণ্ডলী-সেবিত, সদর্থপূর্ণ বেদ-ধ্বনি নভোমণ্ডলে সমুত্থিত হইয়া দিগ্মণ্ডল পুলকিত করিয়া তুলিবে। মহাজ্ঞানী মহাযোগী ঋষিরা অবনত মস্তকে যে বেদের মর্য্যাদা স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন তাহা কখনই পূর্ব্বকালের আর্য্য কৃষকের হৃদয়োচ্ছ্বাস নহে। এই সৃষ্টিতে মনুষ্যের জানিবার জন্য যত প্রকার বিদ্যা আছে তাহার মূল আমরা বেদের মধ্যে নিহিত দেখিতে পাই। কি পদার্থ বিদ্যা, কি জ্যোতিষ, কি আধ্যাত্মিক বিদ্যা, কি চিকিৎসা শাস্ত্র, কি গণিত, কি নৌযান বিদ্যা, কি তারবিদ্যা প্রভৃতি সকল প্রকার বিদ্যার মূল বেদের মধ্যে নিহিত আছে। আমাদের তাহা সর্ব্বতোভাবে পাঠ করা কর্ত্তব্য। আশা করি বেদের পুনরালোচনার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সৌভাগ্য-রবি পুনরুদিত হইবে। ভারতের বিষণ্ণ বদন পুনরায় প্রসন্ন হইবে। যে ঋষিদিগের মস্তিষ্ক হইতে কত শত অদ্ভুত অদ্ভুত বিদ্যার আবিষ্কার হইয়াছে, সেই ঋষিরা কি অজ্ঞ ছিলেন। তাঁহারা কি বেদের বিষয় বিচার না করিয়া ইহার গৌরব স্বীকার করিয়াছেন।

এক্ষণে বেদ কি? ও তাহার মর্য্যাদা কি রূপ দেখা যাউক।

কথং বেদঃ শ্রুতিশ্চ দ্বে নাম্নী ঋক্‌সংহিতাদীনাং জাতে ইতি। অর্থবশাৎ। বিদ-জ্ঞানে, বিদসত্তায়াম্। বিদ্‌ন্‌—লাভে। বিদ—বিচারণে। এতেভ্যো হলশ্চেতি সূত্রেণ করণাধিকরণকারকয়োর্ঘঞ্‌ প্রত্যয়ে কৃতে বেদশব্দঃ সাধ্যতে। তথা শ্রু—শ্রবণে। ইত্যস্মাদ্ধাতোঃ করণকারকে ক্তিন্‌ প্রত্যয়ে কৃতে শ্রুতি শব্দো ব্যুৎপদ্যতে।

বিদ—জ্ঞানে, যাহা পাঠ করিলে যথার্থ বিদ্যার জ্ঞান হয়। বিদ—সত্তায়াম্, যাহা পাঠ করিলে লোকে বিদ্বান হয়। বিদ—লাভে, যাহা দ্বারা সমস্ত সুখ লাভ হয়। বিদ—বিচারণে, এবং যাহা দ্বারা মনুষ্যের সত্যাসত্য বিচারের ক্ষমতা জন্মে তাহারই নাম বেদ।

শ্রু—শ্রবণে, আদিসৃষ্টিমারভ্যাদ্যপর্য্যন্তং ব্রহ্মাদিভিঃ সর্ব্বা বিদ্যাঃ শ্রূয়ন্তে হনয়া সা শ্রুতিঃ।

সকলে সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত যাহা হইতে সকল বিদ্যা শুনিয়া আসিতেছে তাহারই নাম শ্রুতি। বেদের অপর নাম ছন্দঃ

ছদি আহ্লাদনে দীপ্তৌ চেত্যস্মাদ্ধাতো রসুনপ্রত্যয়ে পরে চকারস্য চ্ছকারাদেশে চ কৃতে ছন্দস্ ইতি শব্দো ভবতি। বেদাধ্যয়নেন সর্ব্ববিদ্যাপ্রাপ্তের্ম্মনুষ্য আহ্লাদী-ভবতি সর্ব্বার্থজ্ঞাতা চাতশ্ছন্দোবেদঃ অবিদ্যাদিদুঃখানাং নিবারণাৎ সুখৈশ্বরাচ্ছাদনাচ্চ ছন্দোবেদঃ। শতপথ ব্রাহ্মণ।

বেদাধ্যয়ন দ্বারা সর্ব্ব বিদ্যা প্রাপ্তি হেতু মনুষ্য আহ্লাদিত ও সর্ব্বার্থ জ্ঞাত হয়। অবিদ্যাদি দুঃখ নিবারণ এবং সুখে নিমগ্ন করিবার হেতু বেদের অন্য নাম ছন্দঃ।

মন্ত্র মন্ত্রি গুপ্তভাষণে অস্মাদ্ধলশ্চেতি সূত্রেণ ঘঙ্‌ প্রত্যয়ে কৃতে মন্ত্র শব্দস্য সিদ্ধির্জ্জায়তে। গুপ্তানাং পদার্থানাং ভাষণং যস্মিন্‌ বর্ত্ততে স মন্ত্রোবেদঃ।

যাহাতে গুপ্ত পদার্থের ব্যাখ্যা আছে তাহার নাম মন্ত্রবেদ।

মন জ্ঞানে অস্মাদ্ধাতোঃ সর্ব্বধাতুভ্যঃ ষ্ট্রন্‌ ইত্যুণাদি সূত্রেণ ষ্ট্রন্‌ প্রত্যয়ে কৃতে মন্ত্রশব্দো ব্যুৎপদ্যতে। মন্যন্তে জ্ঞায়ন্তে সর্ব্বৈর্ম্মনুষ্যৈঃ সত্যাঃ পদার্থা যেন যস্মিন্বা স মন্ত্রোবেদঃ।

যাহা দ্বারা বা যাহাতে সকল মনুষ্যের সত্যপদার্থের জ্ঞান হয় তাহার নাম মন্ত্রবেদ। নিগম যাহাতে সকল পদার্থের সর্ব্বার্থ জ্ঞান হয় তাহার নাম নিগম।

নিগচ্ছন্তি নিতরাং জানন্তি প্রাপ্নুবন্তি সর্ব্বা বিদ্যা যস্মিন্‌।

বেদের এইরূপ মর্য্যাদা বুঝিয়া এবং তন্মধ্যে স্বীয় হৃদয়োত্থ ধর্ম্মের সম্যক্ প্রতিবিম্ব দেখিয়া ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীমন্মহর্ষি দেব তাহা হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের প্রথম খণ্ড সঙ্কলন করিয়াছেন। এই সমস্ত সঙ্কলিত মন্ত্রে যে সমস্ত সত্য আছে তাহা সর্ব্বকালসাধারণ। পৃথিবীতে যতই উৎপাত উপস্থিত হউক না, যতই কেন নানারূপ বিপ্লবের পর বিপ্লব আসুক না কিন্তু এই সমস্ত সত্য কোন কালেই বিলুপ্ত হইবে না, কারণ মনুষ্যের আত্মায় ইহা স্বর্ণাক্ষরে স্বয়ং ঈশ্বর মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু যখন পৃথিবীর অন্যান্য অংশ অজ্ঞান অন্ধকার ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল, যখন অন্যান্য দেশের লোক সকল আহার,

নিদ্রা, বিবাদ কলহ লইয়া কেবল পশুবৎ জীবন কাটাইত সেই সময়ে ভারতের মহাজ্ঞানী প্রাচীন ঋষিরা ধ্যানযোগে এই সমস্ত সত্য আবিষ্কৃত করিয়াছেন, সুতরাং ইহা আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি। শ্রীমন্মহর্ষি দেব স্বপ্রভাবোজ্জ্বল সেই সমস্ত সত্য ব্যাপক কালের পর ভারতে পুনঃ প্রচার করিয়া যে উপকার করিয়াছেন তাহা বাক্যে ব্যক্ত করিবার নয়। এই উপকার সূত্রে তিনি এ দেশের চির কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়া থাকিবেন সন্দেহ নাই।

হীরক জুবিলি।

মহারাণী বিক্টোরিয়ার রাজ্যকাল ষষ্টিতম বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। তদুপলক্ষে কি ভারত কি ইংলণ্ড সর্ব্বত্র তাঁহার কৃতজ্ঞ প্রজা সকল মহোৎসব করিয়াছিলেন। অনেক দেবালয়ে তাঁহার আরও দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া প্রার্থনা ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। বস্তুত তাঁহার রাজত্বে প্রজারা পরম সুখী। এখন সকলের ধন প্রাণ সুরক্ষিত। চতুর্দিকে বিলক্ষণ শিক্ষা বিস্তার হইতেছে। লোকে বিনা ব্যাঘাতে স্ব স্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিতেছে। ইহা অপেক্ষা প্রজার পক্ষে আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে। ফলত আমরা মহারাণী বিক্টোরিয়ার শাসনে পরম সুখী। ঈশ্বরের নিকট কায়মনে প্রার্থনা করি তিনি আরও দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া পুত্রবৎ প্রজাদিগের সুখ বর্দ্ধন করুন।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৮, জ্যৈষ্ঠ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	১৭৭৸৴০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৬২৩৲
সমষ্টি	...	৮০০৸৴০
ব্যয়	..	১৭৫।৵৯
স্থিত	...	৬২৫৴৩

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন এক কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲
হাওলাত শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু	৭৲
সমাজের ক্যাশে মজুত	১১৮৴৩
	৬২৫৴৩

আয়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৩৷৵০
৺ বাবু জয়গোপাল সেন, কলিকাতা		১৲
শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী ঐ		৩৲
" " আশুতোষ চক্রবর্ত্তী, ঐ		১২
" " হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, মেদিনীপুর		৩৲
" " দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হালিসহর		৫৷৴০
" " গোপালচন্দ্র বড়াল, পাহাড়পুর		৩৷৴০
" " কালীপ্রসন্ন ঘোষ, জয়দেবপুর		৬৸০
		২৩৷৵০
পুস্তকালয়	...	৫৸৵০
যন্ত্রালয়	... ...	১৪৪৷০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৩৷০
সমষ্টি		১৭৭৸৴০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৪৩৸/৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৮৷/৩
পুস্তকালয়	...	২১৲
যন্ত্রালয়	...	৮২/৩
সমষ্টি	...	১৭৫।৵৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দশ কল্প।

তৃতীয় ভাগ।

ভাদ্র ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৮।

৫০৯ সংখ্যা ১৮১৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

উপদেশ।

যখন আমরা সংসারের শোকে দুঃখে একান্ত মুহ্যমান হইয়া পড়ি, যখন প্রতি কার্য্যের পশ্চাতেই দুঃখের করাল হস্ত প্রসারিত দেখি, যখন সংসারের শান্তির সুবিমল স্থির মূর্ত্তির প্রসাদলাভে বঞ্চিত হই, তখনই ঈশ্বরকে জানিবার জন্য ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়।

সংসারে দুঃখ শোকের প্রবল সংঘর্ষণ আছে বলিয়াই আমরা তাঁহাকে জানিতে চাই,—

"দুঃখ ত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ"

দুঃখত্রয়ের আঘাতে নিষ্পীড়িত হইয়াই, তাহার বিনাশার্থ আমাদের জিজ্ঞাসা আমাদের চেষ্টা উপস্থিত হয়।

সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, শীত গ্রীষ্ম, আলোক অন্ধকার, সৌহার্দ্দ শত্রুতা এই দ্বন্দ্ব রাশির নামই সংসার। পরস্পর নিরপেক্ষ কোন জ্ঞান সংসারে থাকা অসম্ভব, দ্বন্দ্ব ছাড়া সংসারকে বুঝিবার অন্য উপায় নাই,—ইহা যেমন আমরা বুঝি; তেমনি এই বৈপরীত্যের অভ্যন্তরে আর একটি মঙ্গলপূর্ণ উজ্জ্বলভাব আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। সংসার যদি দ্বন্দ্ব রাশির উপাদানে গঠিত না হইত, তবে আমরা তাঁহার পবিত্র প্রেমাশ্রয় প্রাপ্তির প্রত্যাশাও করিতাম না। সংসারের বিষাদ বিপত্তি, দুঃখ শোকে আমরা চেতনা পাই, তাঁহাকে জানিবার ইচ্ছা লাভ করি; আবার সংসারের আনন্দ হর্ষ, সম্পৎ সুখে পরম সুখের আভাস প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণসুখস্বরূপকে জানিবার জন্য ব্যাকুল হই। করুণাময় সংসারকে কি সুন্দর উপাদানে প্রস্তুত করিয়াছেন! একদিকে অন্ধকার—হাহাকার, অন্যদিকে আলোক—আনন্দের আকর্ষণী ছায়া!

স্নেহময় জনকজননী, পুত্র কন্যাকে অপার স্নেহ দান করেন, প্রয়োজন বুঝিলে উচ্ছৃঙ্খলতা পরিদর্শন করিলে, প্রাণাধিক পুত্র কন্যাকে আবার তাড়নাও করেন; কিন্তু সেই তাড়নার মূলে বিদ্বেষ নাই, ঐ তাড়নাও পুত্র কন্যার ভবিষ্যৎ অশেষ কল্যাণের পথ প্রমুক্ত করিয়া দেয়, ইহা যেমন সর্ব্বসম্মত সত্য; তেমনি দয়াময়ী বিশ্ব-জননী মায়া মোহে হতচেতন

মনুষ্যকে সচেতন করিবার জন্য দুঃখ দুর্দিনের মধ্যে ফেলিয়া পরম কল্যাণের পথে—পরম-শান্তি-নিকেতনের পথে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিতেছেন, ইহা আরও স্ফুটতর সত্য! সংসারের জননীর অভিপ্রায় মঙ্গলপূর্ণ হইলেও ভ্রম প্রমাদের প্রভাবে কদাচিৎ ভ্রান্ত শাসনও পুত্র কন্যাকে সহ্য করিতে হয়; কিন্তু সেই সর্ব্বদর্শিনী বিশ্বজননীর শাসন যেমন বিদ্বেষবিহীন, তেমনি ভ্রম-প্রমাদ-পরিশূন্য; সুতরাং কোন প্রকার দুরবস্থায় পতিত হইয়াই তাঁহার মঙ্গলময় ব্যবস্থায় দোষারোপ করিতে আমাদের বিন্দুমাত্রও অধিকার নাই।

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধুভবতি হীয়তেঽর্থাৎ যউ প্রেয়ো বৃণীতে"।

শ্রেয় এবং প্রেয় মনুষ্যের নিকট উপস্থিত হয়, তিনি সম্যক্ বিচার করিয়া উভয়কে পৃথক করেন, তন্মধ্যে যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, তাঁহার মঙ্গল হয়, আর যিনি প্রেয়কে গ্রহণ করেন, তিনি পরমার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হন। করুণাময় বিশ্বপিতা করুণা করিয়া আমাদিগকে ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য বিবেক শক্তি দান করিয়াছেন, আমরা ঐ বিশিষ্ট শক্তির সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে বিচার করিয়া অধর্ম্ম অকর্ত্তব্য পরিহার পুরঃসর ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পারি। তিনি আমাদিগকে অজস্র প্রেমদান করিতেছেন এবং তাঁহার আশ্রয়ে শাশ্বত শান্তি উপভোগ করিবার জন্য নিয়ত নানাপ্রকারে ইঙ্গিত করিতেছেন; অথচ তাঁহার প্রতি স্থির লক্ষ্য না থাকিলে, আমাদের প্রকৃত সুখ শান্তি, প্রকৃত তৃপ্তি, আত্মার যথার্থ কল্যাণ, আকাশ কুসুমবৎ অলীক, ইহা বুঝিবার শক্তি এবং বিবিধ উপায় বিধান করিয়াছেন।

সংসারকে আমাদের ভাবিলে, অথবা সংসারকেই আমাদের চরম-স্থান চিন্তা করিলে, সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বরাশির প্রবল সংঘর্ষণে আমাদিগকে নিরন্তর নিষ্পেষিত হইতেই হইবে; কিন্তু তাঁহার প্রতি স্থির-লক্ষ্য রাখিয়া সেই বিশ্বরাজ-রাজেশ্বরকে সংসারের রাজা করিয়া আমরা যদি তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করি, তাঁহারই সংসারে সদ্‌ভৃত্যের ন্যায় যথা নিয়মিত কার্য্য সমষ্টি সুচারুরূপে সম্পন্ন করি, তবে এখানেই সেই দ্বন্দ্বাতীত ভূমানন্দ লাভ করিয়া আমাদের মানব-জন্ম চরিতার্থ হইতে পারে।

পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি প্রেমভরে গাহিয়াছিলেন,

ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদ্‌বয়ং ন চেদবেদির্ম্মহতী বিনষ্টিঃ।
যএতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি অথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি॥

এখানে থাকিয়াই আমরা তাঁহাকে জানিয়াছি; আমরা যদি তাঁহাকে না জানিতাম, তবে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন, অন্য সকলে দুঃখভোগ করে। এই সুপ্রাচীন মহাবাক্যের প্রতিপদ জ্বলন্ত মহাসত্য উদ্গীরণ করিতেছে, বস্তুতই "অথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি" তাঁহাকে না জানিয়া আমরা নিদারুণ দুঃখভোগ করিতেছি, "যএতদ্‌বিদুরমৃতাস্তেভবন্তি" এবং যাঁহারা তাঁহাকে জানেন তাঁহারা মৃত্যুভয় হইতে মুক্ত হইয়া শাশ্বত শান্তিও উপভোগ করিতেছেন।

সংসারকে ব্রহ্মের সত্তায় নিমজ্জিত করিতে পারিলেই সংসার মধুময় হয়, কিন্তু তাঁহাকে এখান হইতে বিদায় করিলেই সংসার কঠোরতার লীলাভূমি, তাই উপনিষদ বলেন,

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।"

"সংসারের সমগ্র বস্তু রাশিই পরমেশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত জানিয়া অর্থাৎ সংসারকে তাঁহার সত্তায় ওতপ্রোত ভাবে নিমজ্জিত জানিয়া পাপ-চিন্তা ও বিষয়বাসনা পরিহার পূর্ব্বক, ব্রহ্মানন্দ উপভোগ কর। কাহারও ধনে লোভ করিও না"। তিনি সংসারের স্বামী, সংসার তাঁহার, তিনি আমাদের এখানে যাহা করিতে পাঠাইয়াছেন, আমাদের যেটুকু ন্যায়সঙ্গত কর্ত্তব্য, তাহা ছাড়িয়া অপরের অধিকারে হস্ত প্রসারণ করিলেই তাঁহার অপ্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল, তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করা হইল, অতএব সর্ব্বত্র সর্ব্বকার্য্যে তাঁহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া, আমাদের কর্ত্তব্যের প্রতি তদীয় সযত্ন-বিন্যস্ত অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ জ্ঞানপূর্ব্বক অনুভব করিয়া, অতি সন্তর্পণে—অতি শান্ত ভাবে, কর্ত্তব্যানুষ্ঠানরূপ তদীয় প্রিয় কার্য্য প্রেমের সহিত আমাদিগকে সম্পন্ন করিতে হইবে। অন্যথা আপাততঃ প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তিকর বিষয় সম্ভোগে আসক্ত হইলে, আমাদের পরিণাম ঘোর শোচনীয় ও ভয়ঙ্কর! সেই জন্যই ভক্ত ঋষিমণ্ডলীর হৃদয়-কন্দর হইতে গৈরিক-নিস্রবের ন্যায় প্রবল বেগে ছুটিয়া বাহির হইয়াছে,

"য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি অথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি।"

যে তাঁহাকে জানে, সে সংসারের সর্ব্বত্র সর্ব্বকার্য্যে তাঁহাকে বর্ত্তমান দেখিতে পায়, সুতরাং প্রকৃতির প্রলোভন তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে না, প্রলোভনের হস্ত ছাড়াইতে পারিলেই পাপ মৃত্যুভয় বিদূরিত হয়, সুতরাং তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন, আর তাঁহাকে না জানিলেই প্রলোভনের রাজ্য, প্রলোভনের যেখানে আধিপত্য, সেখানেই পতন, সেখানেই মৃত্যু।

দয়াসিন্ধো! চতুর্দ্দিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিকার্য্যে আমাদের শিক্ষার জন্য আমাদের মঙ্গলের জন্য কত সুচারু ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছ, কত প্রকারে তুমি আমাদিগকে তোমার প্রতি আকর্ষণ করিতেছ। যখন আমরা শোকে দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়ি, তখন কতপ্রকারে তুমি আমাদিগকে সান্ত্বনা দেও, কত প্রকারে বুঝাও তুমি আমাদের পিতা—তুমি আমাদের মাতা থাকিতে—আমাদের কিসের চিন্তা কিসের ভয়, কিসের দুঃখ কিসের শোক? কিন্তু প্রভো! অধম অকৃতজ্ঞ আমরা তোমার সেই অভয় বাণী শুনিয়াও শুনি না, তোমার আকর্ষণ বুঝিয়াও বুঝি না; তুমি যে আমাদের সর্ব্বস্ব, তুমি যে আমাদের প্রেম প্রীতির একমাত্র আধার, তোমাকে ছাড়িয়াই যে আমাদের সর্ব্বনাশ—হাহাকার! তাহা জানিয়াও জানি না, তাই বলি হে দয়াময়! তুমি দয়া করিয়া আমাদের নিকটে তোমার স্বরূপ প্রকাশিত কর, আর আমরা তোমার পানে তাকাইয়া প্রেমানন্দে প্রেমকণ্ঠে বলি,—

"ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব,
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব,
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব॥"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

বেদ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

বেদভাগ উপনিষদ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিষ্ঠা এজন্য উহা এদেশে সমস্ত শাস্ত্রের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। কি বেদান্ত কি ন্যায় যে কোন তর্কগ্রন্থ পাঠ কর দেখিতে পাইবে বেদে যে বিষয়ের প্রমাণ

নাই তাহা তাদৃশ আদরণীয় হয় নাই। এই জন্য গ্রন্থকারেরা বেদানুকূল যুক্তি দিয়া স্বমত স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই সমস্ত বৈদিক গ্রন্থের পর আর আর যে সকল গ্রন্থ এদেশে রচিত হইয়াছে তাহাতে অবশ্যই স্থানে স্থানে বেদাতিরিক্ত মত আছে কিন্তু ঋষিগণের উদ্ভাবিত বলিয়া পরবর্ত্তী গ্রন্থকারেরা যদিও তাহা প্রমাণ-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু তাহা বেদের নিম্নে। শ্রুতি স্মৃতিতে বিরোধ ঘটিলে শ্রুতিরই বলবত্তা থাকে স্মৃতির নহে। যাঁহারা প্রকৃত বিদ্বান সাধু ও রাগদ্বেষশূন্য সেই সমস্ত ঋষিরাই বৈদিক কবি। তাঁহা-দের হৃদয়োত্থ সত্যই বৈদিক সত্য। এই জন্য সর্ব্বাপেক্ষা বেদেরই গৌরব।

এ যাবৎকাল বৈদিক গ্রন্থ বলিয়া যতগুলি স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে সমস্তই যে উক্ত প্রকার আদিম ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রণীত অনেকেই এ কথা বলেন না। যাঁহারা দয়ানন্দ স্বামীর বিচার-গ্রন্থ সকল অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা শাস্ত্রীয় প্রমাণেই বুঝিবেন এক সংহিতা ভিন্ন তিনি অপর কোন বৈদিক গ্রন্থের প্রামাণ্য স্বীকার করেন নাই। এই জন্য বেদ বলিয়া পরিচত যত গ্রন্থ আছে তন্মধ্য হইতে যতটুকু অংশ গ্রহণ করা যাইতে পারে তিনি তাহাই গ্রহণ ও অপর অংশ পরিহার করিয়াছেন। এই মহাজ্ঞানী আচার্য্য বর্ত্তমান কালে সর্ব্বসাধারণে প্রচ-লিত উপধর্ম্মে শৈশবাবস্থা হইতেই সন্দি-হান হন। পরে অনেক অধ্যয়ন ও অনু-সন্ধানের পর বেদবিচারে ধর্ম্মনির্ণয় ক-রিয়াছিলেন। কিন্তু এই কার্য্যে যে তাঁহারই প্রথম উদ্যম তাহা নহে। আ-মরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব যে এইরূপ বেদবিচার স্বামীর বহুপূর্ব্বে এ দেশে হইয়াছিল। শ্রীমন্মহর্ষিদেব প্রচলিত উপধর্ম্মে সংশয়াপন্ন হইয়া সত্যানু-সন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং বহু তপস্যা ও বহু অনুসন্ধানে যে আলোক প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন তাহা দ্বারাই বেদবিচার করিয়া-ছিলেন। ইহারই ফল ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের প্রথম খণ্ড উপনিষদ ভাগ। তবে উভয়ের বিচারগত একটু পার্থক্য আছে। স্বামী দয়ানন্দ বহুপ্রাচীন শাস্ত্রীয় প্রমাণে বেদের অপরাপর অংশ ত্যাগ করিয়া কেবল সং-হিতা ভাগকেই রক্ষা করিয়া যান কিন্তু মহর্ষিদেব যে হৃদয় হইতে উপধর্ম্ম সম্বন্ধে সংশয় উঠিয়া ছিল সেই হৃদয়েরই আ-লোকে বেদবিচার করেন। এই জন্য স্বম-তের অনুকূল অংশ গ্রহণ ও অপর অংশ পরিবর্জন করিয়াছেন। বেদবিচারে এইরূপ প্রণালীগত পার্থক্য থাকিলেও উভয়ের ফল একইরূপ হইয়াছে। উভয়েরই মত নিরাকার জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বর অমূর্ত্ত, বেদ সেই অমূর্ত্ত ঈশ্বরকেই প্রতিপাদন করি-তেছে। এখন কেবলই মূর্ত্তিপূজার প্রাদু-র্ভাব, ধর্ম্ম প্রকৃত সত্যে প্রতিষ্ঠিত না হইলে দেশের কোনই মঙ্গল নাই। সেই মূর্ত্তিপূজা উচ্ছেদের নিমিত্ত এবং তন্মূলক সমস্ত কুসংস্কার দূর করিবার নিমিত্ত এ দেশে বেদই ব্রহ্মাস্ত্র। বেদ-বলে তাহা নিরাস করিতে হইবে! ফলে বহুদিনের পর এখন অনেকেই বুঝিয়াছেন জনসমাজের প্রচলিত ধর্ম্ম অর্থাৎ মূর্ত্তি-পূজা বেদসম্মত নহে। ভারতে এই বেদ যে কিরূপ গৌরবভূমি তাহা পূর্ব্ব-কালের একটী দৃষ্টান্তেই বুঝা যায়। যখন ক্ষত্রিয়জাতি ব্রাহ্মণদিগের সহিত প্রতি-যোগিতা সূত্রে এক অভিনব ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করেন, যে ধর্ম্ম এক সময় রাজধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিল, যাহাকে দৃঢ়মূল কবিবার নিমিত্ত

অনেকানেক দার্শনিক প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, যাহা রাজার সাহায্যে এই বিশাল ভারতভূমির প্রায় সমস্ত দেশ সমস্ত নগরে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল সেই ধর্ম্মের বিলোপ দশা কেন ঘটিল? এস্থলে মুক্ত-কণ্ঠে বলিব এক মাত্র বেদকে অস্বীকার করাই তাহার মুখ্য কারণ। এদেশের দৃঢ় বিশ্বাস যাহা বেদবিরুদ্ধ তাহা অধর্ম্ম এই জন্য বৌদ্ধ ধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গসৌষ্ঠব সম্পন্ন হইলেও কেবল বেদবিরোধি বলিয়া কালে রক্ষা পাইল না।

মহর্ষিদেব ও স্বামী দয়ানন্দ স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মসংস্কারের মধ্যে এই বেদকে রক্ষা করিয়া এদেশে একেশ্বরবাদকে দৃঢ়মূল করিয়াছেন। ভারতের সমস্ত হিন্দু এই বেদরূপ মহাবৃক্ষের মূলে অবস্থিত। এই বেদ সুরক্ষিত হওয়াতে এরূপ আশা করা যায় যে, কালে এদেশীয় সকলের মধ্যে সম্প্রদায়গত ধর্ম্মগত পার্থক্য বিদূরিত হইয়া একমাত্র নিরাকার ঈশ্বরের পূজা প্রবর্ত্তিত হইবে। আর দেশ মধ্যে প্রকৃত একতা নামে যদি কোন পদার্থ থাকে তাহা ভবিষ্যতে এই নিরাকার ঈশ্বরপ্রতিপাদক বেদ দ্বারাই হইবে। ফলত ভারতের এই দুই ধর্ম্মসংস্কারক এই মহাপ্লাবনের দিনে বেদের গৌরব রক্ষা করিয়া যথার্থতই স্বদেশহিতৈষিতার পরিচয় দিয়াছেন। যাঁহারা দেশের ধর্ম্ম ও দেশের আচার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ধর্ম্মসংস্কার ও সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত হন তাঁহারাই দেশের প্রকৃত বন্ধু। এখন একটী ভীষণ বিপ্লবের কাল আসিয়াছে। ইহার বলে এ দেশের ভাল মন্দ সমস্তই নির্ব্বিচারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। যখন এই উত্তাপ ক্রমশঃ প্রশমিত হইয়া আসিবে সেই শান্তির কালে এই দুই সংস্কারকেরই নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে এবং জনসমাজে ইহাঁদেরই গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিবে।

প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা ভিন্ন আত্মোন্নতি সম্পূর্ণ অসম্ভব। জীব অপূর্ণ, ইহার জ্ঞান প্রেম যতই প্রসারিত হউক না কেন তথাচ এই অপূর্ণতার কিছুতেই পরিহার হইবে না। ব্রহ্মের সহিত জীবের এই বিষয়ে খুব পার্থক্য। আর এই পার্থক্য থাকাতেই উপাসনার সৃষ্টি হইয়াছে। আমি সকল বিষয়ে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, আর তিনি মহান। আমি তাঁর দ্বারস্থ না হইলে তাঁর নিকট প্রার্থনাদি না করিলে আমার পরিত্রাণ কোথায়। তিনি নিত্যকালই আমার উপাস্য আমি নিত্য কালই তাঁর উপাসক। ইহাই প্রকৃত দ্বৈতবুদ্ধি। স্বামীজী এই সম্বন্ধে মহর্ষিদেবের সহিত খুবই একমত। আমরা সময়ান্তরে দেখাইব স্বামীজী এই দ্বৈতবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া কি অসাধারণ প্রতিভাবলে বেদভাষ্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমাদের বিশেষ বিচার্য্য এই যে, এই দুই বেদমার্গী ধর্ম্মসংস্কারকের মধ্যে কে বেদাবলম্বনে দেশব্যাপী মূর্ত্তিপূজার উচ্ছেদসাধনে বিশেষ কৃতকার্য্য হইবেন।

ধর্ম্ম ও গৃহ্য অনুষ্ঠানসংস্কার করাই ধর্ম্মসংস্কারকের প্রধান কার্য্য। এই দুই সংস্কারক তাহাতেই স্ব স্ব জ্ঞান ও শক্তি বিনিয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু স্বামীজীর বেদভাষ্য পাঠে দেখা যায় তিনি চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি শব্দগুলিকে ব্রহ্মপ্রতিপাদক শব্দ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। এ বিষয়ে তিনি অবশ্য প্রাচীনতম শাস্ত্রীয় প্রমাণেই স্বমত সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন কিন্তু আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতেছি তিনি দেশব্যাপী মূর্ত্তিপূজার উচ্ছেদ সাধন করিতে

গিয়া এইখানেই তাহার বীজ স্বহস্তেই রোপণ করিয়াছেন। মনে কর আমরা বুঝিলাম চদি হর্ষে এই ধাতু অবলম্বনে, এবং আহ্লাদজনক এই অর্থে, আর এষ হ্যেবানন্দযাতি এই শ্রুতিপ্রমাণে চন্দ্রশব্দের একটা ব্রহ্মপর ব্যাখ্যা হইল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি সাধারণ নিরক্ষর লোক এইরূপ ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ গ্রহণে সমর্থ, না তাহারা চন্দ্র শব্দে গগনবিহারী জ্যোতিঃ পদার্থকে গ্রহণ করে। আমাদের বোধ হয় ব্যাকরণবিশারদ পণ্ডিতের পক্ষে চন্দ্র যে অর্থ লইয়াই আসুন না তুমি আমি চন্দ্রশব্দে আকাশের চাঁদকেই বুঝিব। আর একটু কথা। যে শব্দের যে অর্থ প্রসিদ্ধ তাহার স্থলে কোন ভিন্নার্থের প্রয়োগ ঘটিলে তাহাতে নিহতার্থতা দোষ ঘটে। মনে কর শম্বর একটা দৈত্যের নাম। কিন্তু যদি কেহ বলেন যমুনার শম্বর তখন অমরকোষের সাহায্যে বুঝিয়া লইব শম্বর শব্দে জল। শ্রুতিমাত্র-প্রতীত প্রসিদ্ধ অর্থের বাধ হইয়া শব্দের ভিন্নার্থ প্রতিপাদন বড় দোষ। স্বামীজী চন্দ্র সূর্য্যাদির প্রসিদ্ধার্থ ত্যাগ করিয়া প্রমাণবলে ব্রহ্মপর ব্যাখ্যা করায় এই দোষে পড়িয়াছেন। ইহার ফল এই যে তিনি মূর্ত্তি-পূজার উচ্ছেদসাধনে অবশ্য বদ্ধপরিকর, কিন্তু বেদভাষ্য রচনা করিয়া তাহারই বীজ স্বহস্তে রোপণ করিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষিদেবের ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ পরীক্ষা করিয়া দেখ তৎপরিগৃহীত বেদশ্রুতিতে এই দোষ আদৌ স্পর্শে নাই। তাহার কোন স্থলেই কোন শব্দের প্রসিদ্ধার্থ ভিন্নার্থে নিহত হয় নাই। এই জন্য ইহা একরূপ নিঃসংশয়ে বলা যায় যদিও দেশব্যাপী মূর্ত্তিপূজার উচ্ছেদ সাধন ঐ দুই ধর্ম্মসংস্কারকের একমাত্র লক্ষ্য, কিন্তু বেদভাষ্যের এই একটী গুরুতর ব্যতিক্রমে স্বামীজীর একেশ্বরবাদ কালে নিরক্ষর লোকের হস্তে ভিন্নমূর্ত্তি ধারণ করিবে। ইহা মূর্ত্তিপূজার বৃথা আড়ম্বরে পর্য্যবসিত হইবে। অবশ্য এইস্থলে বিচারমল্লেরা বলিতে পারেন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে স্বীকৃত শ্রুতিতে এই দোষ না থাকুক কিন্তু মহর্ষিদেব একটা উপদেশে কোনও বেদমন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। সে মন্ত্রটী এই—রাজা তদ্বেদ বরুণ স্তৃতীয়ঃ। এই স্থলে বরুণশব্দের প্রসিদ্ধার্থ জলাধিপতি, উহা তাহা ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মেই লক্ষিত হইয়াছে। যাঁহারা এরূপ দোষ প্রদর্শনে মহর্ষিদেবের পরিগৃহীত বেদশ্রুতি হইতে মূর্ত্তিপূজার পূর্ব্বাভাস দেখাইবেন আমরা তাঁহাদিগকে বলি, যে মন্ত্রে ঐ বরুণ শব্দ আছে তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বলুন দেখি শ্রুতি মাত্রেই ঐ মন্ত্রোক্ত বরুণশব্দ জলাধিপতি না বুঝাইয়া ব্রহ্মপর হয় কি না। সুতরাং এই স্থলে প্রসিদ্ধার্থের বাধ হয় নাই। কিন্তু স্বামীজী এই সূর্য্য শব্দের ব্রহ্মপর ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তাহার রথ অশ্ব প্রভৃতিও প্রমাণবলে অর্থান্তরে স্থাপন করিয়াছেন। ইহাই প্রকৃত প্রসিদ্ধার্থের বাধ।

আমরা যেমন স্বামীজীর ধর্ম্মসংস্কার সম্বন্ধে ভাবী অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা দেখাইলাম গৃহ্য অনুষ্ঠানেও এইরূপ। তিনি গৃহ্য অনুষ্ঠানে মূর্ত্তিপূজার সংস্রব না থাকে এজন্য বিশেষ সাবধান কিন্তু তাঁহার অতর্কিত ভাবে উহাতে তাহাই স্থান পাইয়াছে। আমরা পরে প্রস্তাবান্তরে সর্ব্বসংস্কারসাধারণ হোমের বিষয় বিবৃত করিব। যদিও স্বামীজীর মতে উহা সর্ব্বদোষবর্জ্জিত কেবল সমাজহিতকর কার্য্য কিন্তু দেখাইব তাহাতেও পৌত্তলিকতার বীজ নিহিত রহিয়াছে।

যজ্ঞ সম্বন্ধে দয়ানন্দের মত। *

যজ্ঞ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে যজ্ঞ কাহাকে কহে, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। সচরাচর যজ্ঞ তিন বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ১ম দেবপূজা, ২য় সঙ্গতিকরণ, ৩য় অর্থদান।

দেবপূজা। দেবশব্দের অর্থ দ্যোতক প্রকাশক। বেদমন্ত্রকেও দেবতা কহে। দেবশব্দে পরমাত্মাও বুঝায়। বিদ্বানও দেবপদবাচ্য; "বিদ্বাংসো হি দেবাঃ", শথপথব্রাহ্মণ। পূজা শব্দের অর্থ সৎকার, যথা পূজিতোঽতিথিঃ পূজিতো গুরু ইত্যাদি। দেবপূজা বলিতে গেলে পরমাত্মার সৎকার বুঝায়। চেতন পদার্থেরই সৎকার সম্ভাবনা, জড় পদার্থ বা মূর্ত্তির সৎকার সম্ভবে না। বেদমন্ত্র পাঠে ঈশ্বরের পূজা হয় বলিয়া প্রাচীন আর্য্যেরা হোমের সময় মন্ত্রের যোজনা করিয়াছেন, এই কারণে যজ্ঞশালাকে দেবায়তন বা দেবালয় কহে।

—তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।

মহাভারত।

ইহারই জন্য ব্রহ্মযজ্ঞ অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন পঞ্চমহাযজ্ঞের অন্যতম।

"স্বাধ্যায়েনার্চ্চয়েতর্ষীন্ হোমৈর্দেবান্ যথাবিধি।"

মনু।

সঙ্গতিকরণ। অত্যন্ত প্রেমের সহিত দেবতার ধ্যান, দেবতা সম্বন্ধে বিচার, সৎসঙ্গকরণ, ইহাকে যজ্ঞ বলা যাইতে পারে।

অর্থদান। বিদ্যাদানের সহিত তুলনায় অন্য দান দানই নহে। অন্নবস্ত্রাদি দান বিদ্যাদানের সহায়তা করে মাত্র। বিদ্যাদানই অক্ষয় দান। অর্থদানও একপ্রকার যজ্ঞ।

যজ্ঞ শব্দের লৌকিক অর্থ কাষ্ঠ ঘৃতাদির দহন। এক্ষণে কথা উঠিতে পারে কাষ্ঠঘৃতাদি অগ্নিসাৎ করিয়া লাভ কি? শথপথব্রাহ্মণে আছে—"জনতায়ৈ যজ্ঞো ভবতীতি" তুষ্টি বর্দ্ধন, সুগন্ধপ্রসার, নীরোগিতা হোম বা হবন হইতে জন্মিয়া থাকে। সেই জন্য শথপথ ব্রাহ্মণে আছে "সংস্কৃতং হবিঃ, হোতব্যমিতি শেষঃ"। কিন্তু তাই বলিয়া অবিধি পূর্ব্বক সমধিক পরিমাণে ঘৃত জ্বালাইলে হোম হয় না। কেহ কেহ বলেন দেবোদ্দেশক ত্যাগকে হোম কহে, দেবতারা হোমের সময় আসিয়া সুগন্ধ গ্রহণ করেন, ইহারই জন্য হোমের আবশ্যকতা। জিজ্ঞাসা করি, সত্য সত্যই দেবতাদিগের নিকট সুগন্ধের এতই কি অভাব যে তাঁহারা আমাদের ক্ষুদ্র হবিঃদ্রব্যের অপেক্ষা রাখেন? কেহ বা বলেন যে শ্রাদ্ধাদি কালে পিতৃ-লোক অবতীর্ণ হইয়া শ্রাদ্ধান্ন বা জলগণ্ডুষ প্রাপ্ত না হইলে ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের মধ্যে দরিদ্রতার কি এতই আধিক্য!

সুবৃষ্টি ও বায়ুশুদ্ধিই হোমের উদ্দেশ্য।*

* স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর যজ্ঞ ও সংস্কার বিষয়ক হিন্দী প্রস্তাব হইতে সংগৃহীত।

* অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা।

মনু ৩। ৭৬।

অর্থ। অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হইলে তাহা (মেঘাকারে) সূর্য্যাভিমুখে গমন করে। সূর্য্য হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন (শস্য); এবং অন্ন (হইতে অর্থাৎ অন্ন শুক্রাকারে পরিণত হইলে) সন্তানাদি উৎপন্ন হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে এরূপ কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন ধূম মেঘাকারে পরিণত হইতে পারে কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। কিন্তু ধূম-বহুল কলিকাতাদি সহরে পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীগ্রাম অপেক্ষা যে অধিক বৃষ্টিপতন হইয়া থাকে ইহা আমাদের বিশ্বাস। হোমের দ্বারা যে গৃহের সাময়িক বায়ুশুদ্ধি হয় তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। লেখক।

উত্তম বায়ু ও উত্তম জল হইতেই সকল-প্রকার অরোগিতা সাধিত হয়। কে না জানেন হরিদ্বারাদি মহামেলায় লক্ষাধিক লোক-সমাগমে জলবায়ুর অবিশুদ্ধিতা নিবন্ধন মধ্যে মধ্যে সহস্র সহস্র লোক কালগ্রাসে নিপতিত হয়। ইহার জন্য ব্রহ্মাণ্ডস্থিত বায়ুর বিশুদ্ধিতা রক্ষা করা চাই। যজ্ঞকুণ্ডে ঘৃত, কস্তুরী, কেশরাদি সুগন্ধি দ্রব্য নিক্ষেপ করা চাই।

কোন কোন অর্ব্বাচীন লোক বলিয়া থাকেন, যে দহন দ্বারা দ্রব্যের পরমাণু নিচয় পৃথককৃত হইয়া উহার গুণ বিনষ্ট হয়, সুতরাং হবন দ্বারা অরোগিতার সম্ভাবনা কোথায়? ইহাতে আমার উত্তর এই যে দ্রব্যের দ্বিবিধ গুণ আছে, এক স্বাভাবিক, দ্বিতীয় সংযোগজন্য। স্বাভাবিক গুণ কিছুতেই নষ্ট হয় না। পদার্থের যদি স্বাভাবিক গুণ স্বীকার করা না যায়, তাহা হইলে সমুদয় পদার্থে গুণ কোথা হইতে আইসে? একটি তিল পেষণ কর, বিন্দু-প্রমাণ তৈল নির্গত হইবে, অনেকগুলি তিল হইতে অধিক পরিমাণে তৈল বহির্গত হইবে। জলপরমাণুতে শীতলতা আছে, তাই জলের শীতলতা স্বাভাবিক। সুগন্ধি দ্রব্য সম্বন্ধেও তাই। বিশেষতঃ সুগন্ধি দ্রব্য জ্বালাইলে যে দুর্গন্ধ বিনষ্ট হয় তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যে যে সুগন্ধি পদার্থ হইতে আতর প্রস্তুত হয়, তজ্জাত আতরে তাহারই গুণ বর্ত্তিয়া থাকে।

অনেকে বলিতে পারেন যে হোম ত সামান্য ব্যাপার, তাহা হইতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বায়ু বিশোধনের সম্ভাবনা কোথায়। বায়ুসাগরের একস্থানে বসিয়া অত্যল্প পরিমাণে কস্তুরী জ্বালাইলে কি সমগ্র বায়ুমণ্ডল পরিশুদ্ধ হইতে পারে? ইহার উত্তর এই একস্থানের বায়ু বিশুদ্ধ হইলে সেই বিশুদ্ধ বায়ু চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া যায়। যদি লোকে নিজ নিজ গৃহে শাস্ত্রোক্ত হোমের ইন্ধন দ্বারা অগ্নি উদ্দীপন করেন, তাহা হইলে বায়ু-মণ্ডল কেন না বিশোধিত হইবে? আর্য্যগণের মধ্যে প্রাচীনকালে এইরূপ নিয়ম ছিল যে প্রত্যেক পুরুষ প্রাতে স্নানান্তে অন্ততঃ অগ্নিতে বার বার আহুতি দিতেন। ইহাতে এই ফল হইত,যে, গৃহে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত মলমূত্রের যে দুর্গন্ধ উৎপন্ন হইত, প্রাতঃকালের হবন দ্বারা তাহা বিনষ্ট হইত; ও সমস্ত দিনের দুর্গন্ধ সায়ংকালের হবনে বিনষ্ট হইয়া রাত্রিকালের বায়ুকে পরিশুদ্ধ রাখিত।

প্রাচীন আর্য্যগণ যে সুবিবেচক ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রাত্যহিক হোমাদি ব্যতীত প্রতি পূর্ণিমায় ও অমাবস্যায় হোম হইত। এইরূপে বায়ু বিশুদ্ধ থাকিত। বৃষ্টির সহিত বায়ুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নিবন্ধন তাহাও বিশুদ্ধ থাকিত। জল ও বায়ুর স্বচ্ছতা ও বিশুদ্ধিতা বশতঃ বৃক্ষের ফল পুষ্প রস অধিকতর শুদ্ধ ও পুষ্টিকারক হইত। অন্নাদি সমস্ত আহার্য্য বস্তুর সমধিক পুষ্টিকারিতা হইতে শরীরে বল বীর্য্য সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি পাইত। এই সকল কারণে কে না জানেন প্রাচীন আর্য্যগণ অমিতবলশালী ছিলেন। ঐতরেয় শতপথ ব্রাহ্মণে আছে যে স্বর্গকামো যজেত, সুখকাম ইতি শেষঃ, উহাই তাহার উদ্দেশ্য।

এক্ষণে হবন দ্বারা পরমেশ্বরের সেবা হয় কি না, তাহাই বিচার্য্য। সেবা শব্দের অর্থ প্রিয় আচরণ। পরমেশ্বরের সেবা অর্থাৎ তাঁহার প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান। স্বর্গ শব্দের অর্থ সুখবিশেষ অথবা বিদ্যা; নরক অর্থে দুঃখবিশেষ অথবা অবিদ্যা।

বিদ্যাই স্বর্গপ্রাপ্তি ও বুদ্ধিবর্দ্ধনের হেতু। বুদ্ধি-বর্দ্ধন শারীরিক দৃঢ়তা অপেক্ষা করে। শুদ্ধ-বায়ু শুদ্ধ-অন্ন ব্যতিরেকে শরীরের দৃঢ়তা কোথা হইতে আসিবে? হোম দ্বারা বায়ু বিশুদ্ধ হইয়া সুবৃষ্টি হয়, উহা হইতে শরীর নীরোগ ও বুদ্ধি বিশদ হয়। বিদ্যাপ্রাপ্তি হইলে স্বর্গপ্রাপ্তি ও সুখ-প্রাপ্তি উভয়ই হইয়া থাকে। *

তবে অনেকে বলিতে পারেন যদি বায়ুশুদ্ধি হোমের লক্ষ্য হয়, তবে হোমের সময় বেদমন্ত্র পাঠের আবশ্যকতা কি? এবং বিশেষ ভাবে বেদী নির্ম্মাণেরই বা ব্যবস্থা কেন? উত্তর এই যে, বিশেষ যোজনা ও আবশ্যক সময়ের অভাবে অনুকূল ফললাভের সম্ভাবনা কোথায়। ইহারই জন্য ঈদৃশ নিয়মিত প্রমাণে বেদী বিনির্ম্মিত হয়, হব্য সুগন্ধিও এরূপ পরিমিত মাত্রানুসারে সংগৃহীত হইয়া থাকে, যে অল্প ব্যয়ে অধিকতর উষ্ণতা সঞ্জাত হইয়া বায়ুকে বিশুদ্ধ করে, বায়ুস্থ জলকণাকে বাষ্পাকারে পরিণত করে, ও অধিক বৃষ্টিপতনের সুবিধা করিয়া দেয়। *

হোমের সময় বেদপাঠ হয় কেন, যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, তাহার উত্তর এই যদি দুই কর্ম্ম এক সময়ে করা যাইতে পারে, তবে তাহাতে আপত্তি কি। মুখে বেদপাঠ চলিতে থাকিল, হস্ত দ্বারা হবন-

---

* লেখকের এ স্থানটিতে কিছু বাক্‌চাতুরী দৃষ্ট হইতেছে। কেহ যদি প্রাতঃকালে হোমের পরিবর্ত্তে মাঠে বায়ু সেবন করিতে বাহির হ'ন, তাহাতে কি তাঁহার শরীরের স্বাস্থ্য-সাধন এবং তন্নিবন্ধন মনের তেজোবর্দ্ধন এবং তন্নিবন্ধন ঈশ্বরোপাসনার প্রতি মনের অনুকূলতা হয় না? এক জন বিজ্ঞ চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হয় তো বলিবেন যে, প্রাতঃকালে গৃহে অগ্নি-প্রজ্বালন অপেক্ষা মাঠে বায়ু-সেবন বেশী স্বাস্থ্যকর। ডাক্তারের কথা ঠিক্ কি লেখকের কথা ঠিক্ তাহা এখানে জিজ্ঞাস্য নহে—জিজ্ঞাস্য কেবল এই যে, কোন্ জাতীয় ঈশ্বর-সেবার কথা হইতেছে? নিত্য অথবা নৈমিত্তিক? সর্ব্বদা সাধ্য-মতে সদুপায় অবলম্বন-পূর্ব্বক লোকের (অর্থাৎ আপনার এবং পরের) হিতসাধন করা যে-জাতীয় ঈশ্বর-সেবা, হোমানুষ্ঠান কি সেই জাতীয় ঈশ্বর-সেবা? অথবা কৃষি-কার্য্য দ্বারা লোকের (অর্থাৎ আপনার এবং পরের) হিতসাধন করা যে-জাতীয় ঈশ্বর-সেবা, উহা সেই জাতীয় ঈশ্বর-সেবা? ইহাই প্রকৃত জিজ্ঞাস্য। হোমানুষ্ঠান যদি শেষোক্ত জাতীয় ঈশ্বর-সেবা হয়, তবে স্ব স্ব রুচি এবং বিবেচনা অনুসারে কোনো ব্যক্তি যেমন কৃষিকার্য্য করেন—কোনো ব্যক্তি বাণিজ্য-ব্যবসায় করেন—কোনো ব্যক্তি রাজ-কর্ম্মচারী হ'ন; সেইরূপ স্ব স্ব রুচি এবং বিবেচনা অনুসারে লোকে গৃহের বায়ু-শোধন করিতে পারেন। অথবা কোনো কোনো সাবধানী ব্যক্তি যেমন কেবল মাত্র আপনার বুদ্ধির উপর নির্ভর না করিয়া "কৃষিকার্য্য করিব, কিংবা বাণিজ্য-ব্যবসায় করিব, অথবা আর কিছু করিব" এইরূপে বিজ্ঞ লোকের নিকট সৎপরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন; তেমনি কোনো কোনো সাবধানী ব্যক্তি সংশয়-স্থলে একজন সুবিজ্ঞ চিকিৎসককে অথবা বিজ্ঞান-বিৎ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন "আপনি আমাকে কিরূপ পরামর্শ দেন—গৃহপ্রাঙ্গণে ধূপধুনা জ্বালাইব, কিম্বা গন্ধক জ্বালাইব, কিম্বা শোধক দ্রব্য ছিটাইব, কিম্বা ঘৃত জ্বালাইব।" অর্থোপার্জ্জন-মানসে কেহ কৃষিকার্য্য না করিয়া বাণিজ্য-ব্যবসায় করিলে তাহাকে যেমন দোষ দেওয়া যায় না; তেমনি বায়ুশোধনার্থে কেহ ঘৃত না জ্বালাইয়া ধূপধুনা জ্বালাইলে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। ঘৃত জ্বালাইতেই হইবে এমন কোনো বিশেষ বাধ্যবাধকতা নাই। সম্পাদক।

* নিয়মের বাঁধাবাঁধি স্থল-বিশেষে যেমন উপকারক; স্থল-বিশেষে তেমনি অপকারক। "সত্য কথা কহিব" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা পালনের জন্য নিয়মের বাঁধাবাঁধি করা খুবই উপকারক; কিন্তু অজিনের সঙ্গে শারীরিক স্বাস্থ্যের বিশেষ সম্বন্ধ কিরূপ তাহা যতক্ষণ না বৈজ্ঞানিক প্রণালী-দ্বারা স্পষ্টরূপে নির্দ্ধারিত হয়, ততক্ষণ "শুদ্ধ অজিনাসন ভিন্ন আর কোনো আসনে উপবেশন করিব না" এরূপ দৃঢ়ব্রত অবলম্বন করা নিতান্তই অবিবেচনার কার্য্য। "অগ্নিদ্বারা গৃহের বায়ু শোধন করিব" এরূপ প্রতিজ্ঞা স্বতন্ত্র, আর অমুক প্রকারে বেদী নির্ম্মাণ করিয়া সে কার্য্য নির্ব্বাহ করিব অথচ বেদীর আকৃতির সহিত বায়ু-শোধনের সহিত কি যে সম্বন্ধ তাহা জানি না, এরূপ প্রতিজ্ঞা স্বতন্ত্র। সং

ক্রিয়া হইতে লাগিল, অথচ সময়ের অপব্যয় হইল না। এবং সর্ব্বকর্ম্মের প্রারম্ভে যে এদেশে বেদপাঠ হইয়া থাকে সে নিয়মও অব্যাহত রহিল, অথচ বেদপাঠের অভ্যাসও জনসমাজে বদ্ধমূল হইয়া গেল। সাধারণে ইহাও লক্ষ্য করিবেন যজ্ঞকালীন পঠিত মন্ত্রের সহিত হোমের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। ঐ মন্ত্রগুলি ঈশ্বরের স্তুতিবাদ মাত্র ১। ফলতঃ ঈশ্বরের স্তুতিগানই যজ্ঞের মুখ্য লক্ষ্য। ২

কেহ কেহ এরূপ বলিয়া থাকেন, যে বেদের ভিতরে অনেকানেক বীভৎস কাণ্ডের উল্লেখ কেন? উত্তর এই, যে বেদের ভিতরে কুত্রাপি বীভৎস কথার উল্লেখ নাই। অর্ব্বাচীন মহীধরাদি ভাষ্যকারই কেবল তাহা দেখিতে পান; উহা বেদের দোষ নহে, পরন্তু তৎসমুদয় ভাষ্যকারগণের বীভৎস বুদ্ধির পরিচায়ক।

প্রকৃতপক্ষে অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্ব ও যজমানপত্নী সম্বন্ধে যেরূপ জঘন্য কথা শুনা যায়,তাহা আদৌ অশ্বমেধ যজ্ঞের তাৎপর্য্য নহে। কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধগণ নিজ নিজ পুস্তকে ঐরূপ বিকৃতার্থ লিপিবদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণগণের অযথা নিন্দা ঘোষণা করিতেন; আমাদের দুর্ভাগ্যবশত তাহাই বেদের স্বরূপার্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে "অগ্নির্ব্বা অশ্বঃ, আজ্যং মেধঃ" অশ্বমেধ অর্থাৎ অগ্নিতে মেধ অর্থাৎ আজ্য দ্রব্য নিক্ষেপ। এইরূপে নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে হরিশ্চন্দ্র ও শুনঃশেফ প্রভৃতির প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যাইতে পারে।

কেনোপনিষদে যজ্ঞের কথা উল্লেখ আছে। উহাতে আছে একখণ্ড তৃণ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া অগ্নিকে বলা হইল, তুমি ইহাকে দগ্ধ কর, অগ্নি পারিল না, বায়ুকে বলা হইল তুমি ইহাকে উড়াইয়া দাও, বায়ু সমর্থ হইল না; পরে ঐ উপনিষদে হৈমবতী ব্রহ্মবিদ্যার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। পরন্তু বৈদিক কালে যজ্ঞে মাংসাদি কখনই নিক্ষিপ্ত হইত না। দেবোদ্দেশে হোম আর হোমের জন্য নিষ্কারণ প্রাণিবধ ইহা ত হইতেই পারে না। দেখ গরুর ন্যায় পরোপকারী শান্ত পশু আর দ্বিতীয় নাই। যজ্ঞের জন্য ইহাকে হনন করিলে কত না অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। দেখ একটি গাভীর চারিসের দুগ্ধে ক্ষীর প্রস্তুত হইলে চারিজনের পুষ্টিকর খাদ্য হইতে পারে। প্রাতে ও সায়াহ্নে দুগ্ধ সংগৃহীত হইলে আট জনের আহার চলিতে পারে। একটি গাভী দশমাস দুগ্ধ দিলে তাহার প্রদত্ত দুগ্ধে ২৪০০ লোকের খাদ্য চলিয়া যায়। এইরূপ আটটী গাভীতে ১৯২০০ লোকের সম্বল হইতে পারে। সুতরাং এরূপ অকারণ গাভী বিনাশ ও তাহার মাংসভক্ষণে জনসমাজের কত না অনিষ্টের সম্ভাবনা;

---

১ পাঠকগণ যেন হোমের মন্ত্রগুলি একবার মিলাইয়া দেখেন। স্থানাভাবে এবার তাহা সন্নিবেশিত হইল না। ভবিষ্যতে ঐ মন্ত্রগুলি লইয়া আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। দয়ানন্দ নিজেও এখানে হোমের কোন মন্ত্র উদ্ধৃত করেন নাই। লেখক।

২ হোমের মন্ত্র পড়িতেই হইবে তাহার বাধ্যবাধকতা কি? হোমের মন্ত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট বা তাহার সহিত সমধর্ম্মী আর কোনো মন্ত্র পড়িলে অথবা কোনো মন্ত্র না পড়িলে বায়ুশোধনের যদি ক্ষতিবৃদ্ধি না হয় তবে তাৎকালিক মন্ত্রপাঠের বিধি কি জন্য? এক জন বালক পায়চালি করিতে করিতে পড়া মুখস্থ করিলে তাহার ব্যায়াম এবং পাঠাভ্যাস দুই কার্য্যই এক সঙ্গে চলিতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া কি এরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম সংস্থাপন করা ভাল যে, মাঠে বায়ু সেবন করিবার সময় বালকেরা পাঠাভ্যাস করিবে!

সম্পাদক।

পূর্ব্বে পাঁচ টাকা মূল্যে যে বলদ পাওয়া যাইত, বর্ত্তমানে পঞ্চাশ টাকা দিলেও সেরূপ মিলে না। দুঃস্থ লোকে ঘৃত দুগ্ধের আস্বাদ একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ যে দেশে মাংস ভোজন প্রচলন নাই, সেখানকার লোকেরা কত না সুখী ও কত না সমৃদ্ধিশালী। *

উপরে অকারণে হোমে পশুবধের অপকরিতা দেখাইলাম। কিন্তু এই হোম দ্বিবিধ, এক রাজধর্ম্মসম্বন্ধী আর এক সামাজিক। আমি এতক্ষণ সামাজিক হোমের কথাই বলিয়াছি; কিন্তু রাজধর্ম্ম সম্বন্ধী হোম অন্যরূপ। দেশের বা জনসমাজের কল্যাণসাধনার্থে যুদ্ধপ্রসঙ্গে যে সহস্র সহস্র লোকহত্যা কখন বা ভয়ঙ্কর শ্বাপদাদি ও অরণ্য জন্তুর বিনাশ অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়ায় ইহা তাহাই। কিন্তু তাই বলিয়া সামাজিক হোমে প্রাণিবধ বা পশুপীড়া কোনরূপেই সঙ্গত হইতে পারে না, এ সমস্তই ঈশ্বরপ্রণীত ব্যবহারের বড়ই বিরুদ্ধ।

কর্ম্মকাণ্ডে যাহার প্রবৃত্তি হোমে তাহারই অধিকার। কর্ম্মে বিচারশক্তি অল্প অল্প জাগ্রত হয়, উপাসনা দ্বারা বিচারের নির্ম্মলতা জন্মে, এবং জ্ঞান দ্বারা বিচারের দৃঢ়তা আইসে।

অনেকে বলিতে পারেন যে আজকাল রাজনিয়ম দ্বারা গ্রাম নগরের বিশুদ্ধিতা রক্ষা পাইতেছে, সুতরাং হোমের আর আবশ্যকতা কি? উহাতে আমার উত্তর এই যে প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহ স্বচ্ছ ও পরিষ্কৃত না থাকিলে, গ্রামের পরিচ্ছন্নতা কোথা হইতে আসিবে, নগরের উপবিভাগের ও গ্রামের দুর্গন্ধই বা কিরূপে বিনষ্ট হইবে। যদি কেহ বলেন রেলগাড়ি ও রন্ধনশালা হইতে যথেষ্ট পরিমাণে ধূম বিনির্গত হয়, ইহার উপরে আর হোমের আবশ্যকতা কেন? আমার উত্তর এই যে, ঈদৃশ দুর্গন্ধযুক্ত দূষিত ধূমে বায়ুশুদ্ধির সম্ভাবনা কোথায়। বিশেষতঃ অগ্নি ও সূর্য্যোত্তাপেই কেবল বায়ু বিশোধিত হইয়া থাকে।

পাঠকগণ দেখিলেন স্বামী দয়ানন্দ কি চক্ষে হোমকে দেখিতেন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও বেদ সম্বন্ধে অসাধারণ জ্ঞান, তদীয় মতামতের উপর সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার প্রকৃত অধিকারী। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ বেদের সমসাময়িক একখানিও টীকা নাই। মহীধর ও সায়ণ বর্ত্তমান যুগের লোক; বৌদ্ধ বিভ্রাটের গণ্ডগোল নিবন্ধন স্থির মস্তিষ্কে বেদের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করা তাঁহাদের অদৃষ্টে বড় ঘটে নাই। দয়ানন্দই মানসিক ওজস্বিতাবলে বৈদিক যুগের কতকটা প্রকৃত চিত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। ঐ ঘোর বিপ্লবের অবসানে মানসিক দরিদ্রতা বঙ্গের চারিদিকে ছাইয়া পড়িয়াছিল। রঘুনন্দন যখন আবির্ভূত হইলেন তখন প্রচলিত পুঁথির শুদ্ধিতা বা অবিশুদ্ধিতার দিকে তাঁহার দৃষ্টি রাখিবার সুযোগ ঘটে নাই। আজকাল যেমন বোম্বাই, বারাণসী ও বঙ্গের পুঁথি মিলিইয়া প্রকৃত পাঠ নিরূপিত হয়, পূর্ব্বে তাহারও বিশেষ অন্তরায় ছিল। হোমাদি বৈদিক সময়ে যে কি ভাবে কি উদ্দেশে সম্পন্ন হইত, নব্য স্মৃতিকার তাহার মর্ম্মো-

* ঐতিহাসিক সত্য ইতিহাসের প্রণালী অনুসারে বিচার্য্য। যজ্ঞ যে কেবল ভারতবর্ষে ছিল তাহা নহে—গ্রীক রোম প্রভৃতি অনেক দেশে প্রচলিত ছিল। সকল দেশেই যজ্ঞে পশুবধ হইত। আমাদের দেশে যে তাহা হইত না তাহার প্রমাণ কি? বুদ্ধদেব যজ্ঞকালীন পশুবধের বিরুদ্ধে বহুতর আয়াস পাইয়াছিলেন—ইহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। সং।

চ্ছেদ করিবার অবকাশ পান নাই। তিনি কি জানি কেন হোমের অপরিহার্য্য গুরুত্ব বুঝিয়া সমগ্র গৃহ্য অনুষ্ঠানের সহিত তাহা সংযোগ করিয়া দিলেন। ফলে এই দাঁড়াইল আজকালকার চক্ষে বিনা হোমে বিবাহ পণ্ড, শ্রাদ্ধ বা উপবীত বালকের ক্রীড়া মাত্র। আমরা পূর্ব্বাবধিই আদি ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানপদ্ধতিতে হোমের উপর অকারণ নির্ভর স্থাপন করি নাই। আমাদের নিকট দান গ্রহণ সপ্তপদী গমনই বিবাহের তাবৎ। এমন কি দান ও গ্রহণ হইলেই বিবাহ সিদ্ধ হইল। সপ্তপদী গমন বিবাহের পরিপূরক মাত্র। অন্যান্য অনুষ্ঠানের সম্বন্ধেও আমাদের এই কথা। যাঁহারা কেবল বায়ুর বিশুদ্ধিতা রক্ষা জন্য নিয়মিত রূপে প্রাতে ও সায়াহ্নে গন্ধ দ্রব্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে অন্য কথা। তবে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মকে সর্ব্ববিধ বিপদের লেষমাত্র হইতে রক্ষা করিতে চিরকালই প্রয়াসী। আমাদের বিরুদ্ধবাদীগণ সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন যে অগ্নিকার্য্য বিনা বিবাহ অসিদ্ধ। তাঁহারা একবার স্বাধীনভাবে ও প্রশস্ত বুদ্ধিতে দয়ানন্দের যুক্তি ও মতামত আলোচনা করিতে পারেন। আমাদের কথা এই, যে হোমের প্রকৃত তাৎপর্য্য দয়ানন্দমতানুযায়ী হইলেও আমরা তাহা গৃহ্য সংস্কারের মধ্যে আনয়ন করিতে প্রস্তুত নহি। কি জানি এই সামান্য সূত্র হইতে শাখাপ্রশাখা বহির্গত হইয়া পাছে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে এবং আমাদের প্রিয়তম ব্রাহ্মধর্ম্মকে কোন অজানিত ঘোর আবর্ত্তের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া কুসংস্কারের মধ্যে ডুবাইয়া দেয়।

—

পত্র।

শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় নমস্তে।

আপনাদিগের বোলপুরস্থ শান্তিনিকেতনের আশ্রমধারী শ্রীস্বামী অচ্যুতানন্দ মহাশয় তাঁহার প্রচার কালীন গয়াধামে সত্যধর্ম্মের উপদেশ দিয়া বিহারদেশের সর্ব্বপ্রধান নগর পটনা সহরে আসিয়া বেদ ও বেদান্তের সার স্বরূপ ব্রাহ্মধর্ম্মের যে ব্যাখ্যান দিয়াছিলেন তাহার সারাংশ আমি নিম্নে লিখিতেছি। কৃপা করিয়া ইহাকে আপনার পত্রিকার এক পার্শ্বে স্থান দান করিলে যার পর নাই বাধিত হইব।

স্বামীজী বেদ মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রথমে ঈশ্বরোপাসনা করিলেন। পরে পাঁচ ছয় শত শ্রোতৃগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ! আমি পরম পিতার অনুগ্রহে অদ্য আপনাদিগের নগরে আসিয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলাম। আপনারা যে কৃপা করিয়া আমার বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছেন তজ্জন্য আমি আপনাদিগের নিকট অত্যন্ত বাধিত হইলাম ও আপনাদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আপনাদিগের মনে একটা কৌতূহল জন্মিতে পারে যে আমি একজন পশ্চিম দেশীয় হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইয়া কি রূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশক ও প্রচারকের শ্রেণীতে গণ্য হইলাম। আমি সরলান্তঃকরণে বলিতেছি যে আমার ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে মহান্ ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ দেওয়া অসম্ভব তবে আর্য্য ঋষিগণ যে কথা বলিয়া গিয়াছেন সেই ঋষিদিগের চর্ব্বিত চর্ব্বণের অতি সামান্যাংশই আপনাদিগের সেবায়

অদ্য প্রকাশ করিব। হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ! যখন আমি ব্রাহ্মধর্ম্মের রসাস্বাদন করিতে পারি নাই তখন আমার মনেও এক অদ্ভুত ধারণা ছিল যে ব্রাহ্মধর্ম্ম একটা কিম্ভূতকিমাকার বস্তু এবং ব্রাহ্ম ও খৃষ্টিয় সম্প্রদায় প্রায় একই বস্তু। তখন আমি জানিতাম না যে ব্রাহ্মধর্ম্মই আর্য্যদিগের হৃদয়ের ধন ও পুরাতন ঋষিদিগের একমাত্র আদরের পদার্থ।

আমি কিরূপে এই সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলাম তাহা ও প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম কি তৎসম্বন্ধে আপনাদিগের অবগতির জন্য অতি সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি। আমি একদা শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীচরণ দর্শন লাভ করি ও তাঁহার শ্রীমুখ হইতে কেনোপনিষদের লিখিত ব্রহ্ম বিষয়ের উপদেশ প্রথমে শ্রবণ করিয়া যার পর নাই চরিতার্থ হই। পরে মহর্ষির আদেশে পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকটে বেদ ও উপনিষদের সার সংগ্রহ রূপ ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া তদ্ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলাম। এস্থলে দীক্ষিত শব্দের অর্থ এই যে ব্রাহ্মধর্ম্মের তত্ত্ব অবগত হইয়া তাহাই আমার নিজ ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিলাম ও উক্ত ধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্ম প্রতিদিনে জীবনে আচরণ করিব তদ্বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিলাম। অর্থাৎ নিম্নলিখিত ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজে বিশ্বাস করিয়া ঐ ব্রাহ্মধর্ম্ম আচরণ করিব বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

এখন ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ কি? তাহা বলিতেছি

১। ওঁ ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ, তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ।

২। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি-সর্ব্বনিয়ন্তৃ-সর্ব্বাশ্রয়-সর্ব্ববিৎ-সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি।

৩। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি।

৪। তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য-সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

১। প্রথমে কেবল একমাত্র পরব্রহ্মই ছিলেন তদ্ব্যতীত আর কিছুই ছিল না এবং সেই পরব্রহ্মই সমগ্র সৃষ্টি করিয়াছেন।

২। সেই পরমাত্মা জ্ঞান স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়, নিরবয়ব নির্বিকার, একমাত্র অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান স্বতন্ত্র এবং পরিপূর্ণ। কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হইতে পারে না।

৩। একমাত্র সেই পর ব্রহ্মেরই উপাসনা দ্বারা জীবের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধিত হয়।

৪। পরমাত্মাকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাকেই তাঁহার উপাসনা বলে। এখন আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন যে প্রথমে কেবল মাত্র এক পরব্রহ্মই ছিলেন অন্য কিছু ছিল না ও পরব্রহ্মই সমগ্র সৃষ্টি করিয়াছেন, এই সিদ্ধান্তটী প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের অনুমোদিত কি না? ইহাই বাস্তবিক তাঁহাদিগের মত, এ সম্বন্ধে বেদাদি শাস্ত্র হইতে অনেক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু প্রসঙ্গ অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবার ভয়ে কেবল মাত্র দুই চারিটী এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। উপনিষদে লিখিত আছে—

"ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ।
স দেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং।
সবা এব মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ॥"

এই জগৎ প্রথমে কিছুই ছিল না। হে প্রিয় শিষ্য! এই ব্রহ্মাণ্ড উৎ-

পত্তির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরব্রহ্মই ছিলেন। যিনি জন্ম-রহিত আত্মা এবং যিনি অজর অমর নিত্যও অভয় স্বরূপ। সর্ব্বপ্রথমে যে কেবল পরমাত্মাই ছিলেন অন্য আর কিছুই ছিল না ইহা বেদাদি সৎশাস্ত্র বারবার প্রতি-ধ্বনিত করিতেছেন। কয়েকটী উদাহরণ আরও দিতেছি যথা—

"স দেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ
আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ।
ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ
আত্মা বা ইদমগ্র একাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চিন-মিষৎ স ঈক্ষত লোকানন্নুসৃজা ইতি।

উপরোক্ত বিষয় গুলির তাৎপর্য্য এই, একমাত্র সৎস্বরূপ পরমাত্মা, ব্রহ্ম বা আত্মাই সকলের পূর্ব্বে বিরাজমান ছিলেন। নিমেষ ক্রিয়াদিযুক্ত অপর কোন পদার্থই ছিল না। পরমাত্মা ভাবিলেন যে তিনি লোক সকল সৃষ্টি করিবেন। পুনশ্চ ঋগ্বেদাদিতেও পরমাত্মা যে নিজ শক্তি দ্বারাই ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়াছেন তদ্বিষয় লিখিত আছে। যথা—

১। তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে ইত্যাদি।
২। হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতি-রেক আসীৎ। সদধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।
ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি।
যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম।
আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি ইত্যাদি।
জন্মাদ্যস্য যতঃ ইত্যাদি—

এই জগৎ সৃষ্টির প্রথমে সমস্ত অন্ধকার ছিল। পরে পরমাত্মা আপন সামর্থ্যে এই কার্য্যরূপ জগৎ সৃষ্টি করিলেন। ঋষি বলিতেছেন হে মনুষ্য, সূর্য্যাদি সমস্ত তেজস্বী পদার্থের আধার এবং এই দৃশ্য-মান জগৎ বা এতদ্ব্যতীত যাহা সৃষ্ট আছে বা হইবে বা হইতেছে তাহার এক অদ্বি-তীয় পতি পরমাত্মা এই জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। এই পৃথিবী হইতে সূর্য্যাদি পর্য্যন্ত যিনি সৃজন করিয়াছেন সেই পরমদেব পরমাত্মাকে প্রেম ও ভক্তি করিবে।

ঋষি বলিতেছেন "হে মনুষ্য! যদ্দারা এই বিবিধ সৃষ্টি রচিত ও প্রকাশিত হই-য়াছে, যিনি এই সৃষ্টির ধারণ ও প্রলয়-কর্ত্তা, যিনি এই সমগ্র জগতের স্বামী, যিনি ব্যাপক হইয়া সমগ্র জগতের সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা হন, সেই পর-মাত্মাকে তুমি জ্ঞাত হও এবং অন্য কাহা-কেও সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিও না।

যাঁহা হইতে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়া যাঁহার দ্বারা সকলে জীবিত রহিয়াছে এবং প্রলয়-কালে যাঁহার প্রতি সকলে গমন করিবে অর্থাৎ প্রলয় কালে যাঁহাকে সকলে প্রাপ্ত হইবে ও যাঁহাতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রবেশ করিবে তাঁহাকেই বিশেষ রূপে জানিবার ইচ্ছা কর তিনিই ব্রহ্ম। সেই আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মা হইতেই সমগ্র ভূত উৎপন্ন হইয়াছে এবং উৎপন্ন হইয়া সেই আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মের দ্বারাই অর্থাৎ তাঁহার শক্তিবলেই জীবিত রহিয়াছে, আবার প্রলয় কালে সেই আনন্দময় পরব্রহ্মের প্রতিই সকলে গমন করিবে ও তাঁহাতেই প্রবেশ করিবে।

যদ্দারা এই জগতের জন্মাদি অর্থাৎ জন্ম স্থিতি ও প্রলয় ঘটে তিনিই ব্রহ্ম এবং তিনিই জানিবার যোগ্য।

উপরোক্ত ও অন্যান্য অসংখ্য প্রমাণ যাহা উল্লেখ করিলাম না তদ্দারা স্পষ্টই

প্রমাণিত হইল যে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম বীজ সম্পূর্ণ বেদাদি শাস্ত্রের অনুকূল ও আর্য্য ঋষিদিগের অনুমোদিত এবং ইহা স্বকল্পিত নহে।

এখন ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বিতীয় বীজ সম্বন্ধে বিচার করা আবশ্যক। ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বিতীয় বীজ এই যে সেই পরমাত্মা জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ মঙ্গলস্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান্, স্বতন্ত্র এবং পরিপূর্ণ। কাহারও সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে না।

যদিচ এই দ্বিতীয় বীজের সত্যতা উপরোক্ত বেদমন্ত্র ও শ্লোকাদি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে তথাপি বেদাদি শাস্ত্র হইতে আরও কয়েকটী এ বিষয়ের প্রমাণ দিতেছি। যথা শ্রুতিতে লেখা আছে—

"ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি শান্তং শিবমদ্বৈতং"। ইত্যাদি।

ওঁ সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্। কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ"।

ন দ্বিতীয়ো ন তৃতীয়শ্চতুর্থোনাপ্যুচ্যতে। ন পঞ্চমো ন ষষ্ঠঃ সপ্তমো নাপ্যুচ্যতে। নাষ্টমো ন নবমো দশমো নাপ্যুচ্যতে। তমিদং নিগতং সহএব এক একবৃদেক এব। সর্ব্বে অস্মিন দেবা একবৃতা ভবন্তি।

ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃপুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ববীজম্'। ইত্যাদি।

অর্থাৎ সেই জগদুৎপাদক সর্ব্বনিয়ন্তা কল্যাণকারী পরমাত্মা সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ হয়েন। তিনি আনন্দরূপে ও অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি শান্ত মঙ্গলময় ও অদ্বিতীয় হয়েন।

সেই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা নির্ম্মল নিরবয়ব, শিরা এবং ব্রণ রহিত, শুদ্ধ, পাপ ও তাপ রহিত হয়েন, তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা ও সকলের শ্রেষ্ঠ হয়েন। তিনি স্বপ্রকাশ ও সর্ব্বদা যথাযুক্ত অর্থ বিধান করিয়া থাকেন।

সেই পরমাত্মাকে দ্বিতীয় তৃতীয় বা চতুর্থ বলা যায় না। তাঁহাকে পঞ্চম ষষ্ঠ বা সপ্তম বলা যাইতে পারে না। তাঁহাকে নবম বা দশম কিছুই বলা যায় না। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই। তিনি অতীব আশ্চর্য্য জনক ও শান্ত স্বভাব। তিনি কেবল মাত্র এক এবং একই হয়েন। তিনি একমাত্র সমগ্র জগতের আশ্রয় স্বরূপ। সমগ্র জগৎ তাঁহাতেই স্থির রহিয়াছে এবং কেবল মাত্র তাঁহাতেই রহিয়াছে।

ক্লেশ অর্থাৎ অবিদ্যা, অস্মিতা রাগ দ্বেষ অভিনেবেশ রূপ পঞ্চ প্রকার ক্লেশ, কর্ম্ম বা ধর্ম্মাধর্ম্ম, বিপাক অর্থাৎ কর্ম্মফল, আশয় অর্থাৎ শুভাশুভ কর্ম্মের সংস্কার যে পরম পুরুষকে স্পর্শ করিতে পারে না এবং যিনি যাবৎ সংসারী আত্মা ও মুক্তাত্মা হইতে পৃথক বা স্বতন্ত্র তিনিই ঈশ্বর। ইহাঁতে নিরতিশয় জ্ঞান থাকায় তিনি সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ তাঁহাতে সর্ব্বজ্ঞতার অনুমাপক পূর্ণ শক্তি ও জ্ঞান রহিয়াছে যাহা অন্য কোন আত্মাতে দেখিতে পাওয়া যায় না। উপরোক্ত আশয়ের প্রমাণ আমাদিগের আর্য্য শাস্ত্রে ভূরি ভূরি রহিয়াছে কিন্তু প্রসঙ্গ বাড়িবার ভয়ে নিরস্ত হইলাম। ফল কথা ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বিতীয় বীজ যে সনাতন বেদাদি শাস্ত্রের অনুমোদিত ও পুরাতন আর্য্য ঋষিদিগের সনাতন মত তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

এখন ব্রাহ্মধর্ম্মের তৃতীয় বীজ বিচার করা যাউক। তৃতীয় বীজে লিখিত আছে যে এক মাত্র পরমাত্মার উপাসনা দ্বারাই জীবের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধিত হয়। হে ভ্রাতৃগণ এখন এই

তৃতীয় বীজের প্রমাণ স্বরূপ বেদাদি শাস্ত্র হইতে গুটিকত উদাহরণ দিতেছি যথা—

"যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরিতস্থুষঃ।
রোচন্তে রোচনা দিবি।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।
নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুংস্বাম।
মুমুক্ষুণা কিংস্বরিত্তং বিধেয়ং ? সৎসঙ্গতির্নির্মমতেশভক্তিঃ।
সমাধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ।"

মুক্তিসাধন জন্য উপাসনা করিতে হয়। এই জন্য বিদ্বান যোগী পুরুষেরা সমগ্র জীবের হৃদয়ে ও ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত ঈশ্বরকে উপাসনা দ্বারা আত্মার সহিত যুক্ত করেন। সেই পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ, হিংসাদি দোষ রহিত ও কৃপার সমুদ্র। তিনি সকলের আনন্দবর্দ্ধক ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বৃহৎ। এইজন্য পরমাত্মার উপাসনা করিলে উপাসকের আত্মা অবিদ্যাদি দোষ অন্ধকার হইতে ত্রাণ পাইয়া পরমাত্মার প্রকাশে প্রকাশিত হয়।

ক্রমশঃ।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৮, আষাঢ় মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৭১৸৵০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৬২৫৶৩
সমষ্টি	...	৬৯৭ ৻৩
ব্যয়	...	৩৮।৶৩
স্থিত	...	৬৫৮॥৵০

জমা।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত	
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন	
এক কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲
হাওলাত শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু	৭৲
সমাজের ক্যাশে মজুত	১৫১॥৵০
	৬৫৮॥৵০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	... ...	৮৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু বলাইচাঁদ পাইন		৮৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৪১৸০
শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী, সি, আই, ই	কাশীমবাজার	২৪৸০
শ্রীযুক্ত বাবু চক্রধর সাহা,	আমতা	৩৷৵০
„ „ গৌরীশঙ্কর রায়,	কটক	৩।৵০
„ „ গোপালচন্দ্র বড়াল,	পাহাড়পুরে	৩৷৵০
„ „ চন্দ্রমোহন সাহা,	ভাণ্ডারিয়া	১৷৵০
৺ বাবু জয়গোপাল সেন,	কলিকাতা	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ চক্রবর্ত্তী	ঐ	১৲
„ „ খগেন্দ্রনাথ মিত্র	ঐ	৩৲
		৪১৸০
পুস্তকালয়	...	৪৶০
যন্ত্রালয়	... ...	১৮৲
সমষ্টি		৭১৸৵০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৫ ৻৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৬।৶৬
পুস্তকালয়	...	।/০
যন্ত্রালয়	...	৩৷/৬
সমষ্টি	...	৩৮।৶৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দশ কল্প।
তৃতীয় ভাগ।
আশ্বিন ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৮।

৬৫০ সংখ্যা ১৮১৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवाएकमिदमग्रआसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

শকাব্দ ১৮১৯, ২৭ শ্রাবণ।

সাধুসঙ্গ।

ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥

শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, সাধুগণই সংসার-অর্ণবের পর পারে যাইবার নৌকা স্বরূপ। অর্থাৎ একমাত্র উপায়। সাধু-সংসর্গের এত মাহাত্ম্য কেন? কারণ সাধুর সাধুত্ব সেই ঈশ্বর হইতে আসিয়াছে। ঈশ্বরই সাধুভাবের আকর। যেমন সূর্য্যের জ্যোতি চন্দ্রে পড়িয়া চন্দ্র জ্যোতিষ্মান হইয়াছে, সেই রূপ ঈশ্বরের মঙ্গল-জ্যোতি সাধু হৃদয়ে পতিত হইয়া, ইহাকে উজ্জ্বল করিয়াছে। অথবা সূর্য্যের জ্যোতিই যেমন সূর্য্যকান্ত মণির জ্যোতির কারণ, সেইরূপ ঐশিক ভাবই সাধু-হৃদয়ের সর্ব্বস্ব। তাঁহার হৃদয়ের সৌন্দর্য্য স্বর্গের সৌন্দর্য্যকে পরাস্ত করিয়াছে, কারণ এখানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শিবং সুন্দরং বিরাজ করিতেছেন। এখানকার শোভা কে বর্ণন করিতে পারে? মধুপূর্ণ ইন্দীবর যেমন নির্ম্মল জলে বিরাজ করে, সেই রূপ তাঁর জীবন-সরোবরে প্রেম ভক্তি পবিত্রতা-পূর্ণ হৃদয়-পদ্ম শোভা পাইতে থাকে। সকলকে সুখী করিবার জন্যই তাঁর প্রাণ-গত যত্ন। কি তাঁর কথা—কি তাঁর ভঙ্গী—কি তাঁর কার্য্য—সকলই মধুময়।

কঠিন কথা তিনি জানেন না। কৌশলে কেমন করিয়া মর্ম্মান্তিক বেদনা লোককে দিতে হয় তাহা তাঁহার বুদ্ধির বাহিরে। লোককে সুখী করিয়া সমস্ত দিনের কার্য্যাবসানে যখন তিনি বিশ্রামার্থ স্বীয় শয্যায় গমন করেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে কি বিমল আত্মপ্রসাদের জ্যোতিই বিকীর্ণ হয়! ভ্রান্তিবশতঃ যদি কখন তাঁহা কর্ত্তৃক লোকে মনোবেদনা পায়, তাহা হইলে তাঁহার অনুতাপের সীমা থাকে না। মনুষ্যের প্রতি দয়া ক্ষমা প্রেম ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করাই তাঁর জীবনের ব্রত। যিনি এই দুই দিক রক্ষা করিয়া চলেন, তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে সাধু।

ভগবান এই ভূমণ্ডলকে কত সুন্

সুন্দর বস্তু দ্বারাই সজ্জিত করিয়াছেন—কিন্তু যদি ইহাতে সাধুর সৃষ্টি না করিতেন, তবে তাঁহার রচিত সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার অঙ্গহীন হইত। আদর্শ দেবমূর্ত্তি দেখাইবার জন্যই ঈশ্বর তাঁহাকে এ লোকে প্রেরণ করেন। তাঁর যেমন শক্তি, তিনি সেই অনুসারেই পরের দুঃখ মোচন করেন। তাঁর অর্থ থাকে অর্থ দিয়া, না থাকে ত শরীর মন প্রাণ দিয়াও পরোপকার করেন। যে সাধুর এ সবই আছে, তিনি এ সবই দিয়া পরের অশ্রু মোচন করেন। কত সাধুর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, যাঁহারা আপনাদের ন্যায্য প্রাপ্য—প্রভূত অর্থ অধমর্ণের কাতরোক্তি শুনিয়া ধূলিমুষ্টির ন্যায় ছাড়িয়া দিয়াছেন। কত সাধু গোপনে গোপনে কত অনাথ পরিবারের সাহায্য করেন, লোকে তার সন্ধানও পায় না। এই ত গেল তাঁর দয়ার কথা। তাঁহার ঈশ্বরভক্তির কথা আরও আশ্চর্য্য। যে ভক্তির প্রভাবে তিনি ঈশ্বররত্নকে হৃদয়ে বাঁধিয়াছেন—তার প্রভাব কত। তারি প্রভাবে তাঁর স্তিমিত লোচন হইতে দর দর ধারে প্রেমাশ্রু বিগলিত হয়। সেই প্রফুল্ল মুখ কমলের আকর্ষণেই কত দুর্ব্বিনীত দুর্ব্বল হৃদয়ের গতি মুক্তি হইয়াছে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, এক তপস্বী সন্ধ্যার সময় প্রত্যহ গঙ্গাতীরে ঈশ্বর-উপাসনা করিতেন। কোন এক অবিনয়ী যুবক যদৃচ্ছাক্রমে সময়ে সময়ে তথায় উপস্থিত হইত। সৌভাগ্য বশতঃ তপস্বীর সৌম্যমূর্ত্তি তাহাকে মোহিত করিল। সে সেই পবিত্র মূর্ত্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিল। ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ইহাতেই তাহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তাহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। পরিশেষে ব্রহ্মোপাসনার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিল। তিনি পাপ হইতে বিরত হইলেন, এবং ব্রহ্মোপাসনাই তাঁহার ব্রত হইয়া উঠিয়াছিল। এবং এই ব্রহ্মোপাসনার স্বাদ যাহাতে অন্যে পায়, তাহার অনুষ্ঠান তিনি জীবিত অবস্থায় অনেক করিয়াছিলেন। এই নবজীবন লাভের পাঁচ বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি জ্ঞানপূর্ব্বক ব্রহ্মনাম জপিতে জপিতে তনু ত্যাগ করিলেন। কি আশ্চর্য্য! যে দুরাচার এক সময়ে তাহার স্ত্রী ও মাতা প্রভৃতি পরিজনদিগকে অনাচার দ্বারা উত্যক্ত করিয়াছিল, সেই আজ সাধুসঙ্গ প্রভাবে ব্রহ্মধামে চলিল।

দস্যু রত্নাকরের কথা কে না জানে। নরহত্যা করিয়া জীবিকা লাভ করা যার অভ্যাস ছিল, সাধুসঙ্গ প্রভাবে তিনি মহর্ষি বাল্মীকি হইলেন। এক সময়ে নরহত্যা করিয়া যাহার পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইত না, অন্য সময়ে সেই হৃদয়ই ক্রীড়াসক্ত ক্রৌঞ্চ মিথুনকে নিষাদ কর্ত্তৃক আহত হইতে দেখিয়া দয়াতে দ্রবীভূত হইল। সেই দিন হইতেই তাঁহার দিব্যজ্ঞান উদয় হইয়াছিল। মহাপাপী যগাই মাধাইয়ের জীবন যে সাধুসঙ্গ প্রভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা কাহার অবিদিত আছে? এইরূপ কত লোক যে সাধুসঙ্গ প্রভাবে নবজীবন লাভ করিয়াছে, কে তাহার গণনা করিতে পারে? সাধুসঙ্গে যেমন দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, অসাধু সঙ্গে তেমনি অধোগতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। মন্থরা আসিয়া যখন রামের রাজ্যাভিষেকের কথা কৈকেয়ীর নিকট কহিল, তখন তাঁহার কত আনন্দ। কৈকেয়ীর হৃদয় স্বভাবতঃ

কোমল ও সদয় ছিল, কিন্তু কুসঙ্গিনী মন্থরা তাহাতে বিষ ঢালিয়া দিয়াছিল। তাহারই মন্ত্রণা প্রভাবে রামের বনবাস ও দুর্ব্বল হৃদয় দশরথের শোকে প্রাণত্যাগ!

এক শকুনি মন্ত্রীর কুমন্ত্রণায় দুর্য্যোধন কি দুষ্কর্ম্মই না করিল! যুধিষ্ঠির আদি পাণ্ডবগণ কি দুঃসহ যন্ত্রণাই না পাইলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কত প্রাণিহত্যাই ঘটিল। সর্প যাহাকে দংশন করে, সেই মরে, কিন্তু কুসঙ্গী কুমন্ত্রীর কুমন্ত্রণায় সহস্র সহস্র লোক ধনে প্রাণে নষ্ট হয়। অতএব অসাধুসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য, এবং সাধুসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে সেব্য।

পরিশেষে বলিতেছি, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বরই সর্ব্বাপেক্ষা সৎসঙ্গী। তাঁহার সঙ্গে অনুক্ষণ থাকাই বিধেয়। জ্ঞানযোগে সর্ব্বক্ষণ তাঁহাকে হৃদয়ে রাখ। যিনি তদ্গতপ্রাণ সাধু তিনি তাঁহারই সঙ্গে আলাপ করেন, তাঁহারি সঙ্গে কথা কন। সে কথা অন্যে বলিতে পারে না। তাঁহাকে দুঃখ জানাইলে দুঃখ দূর হয়, তাঁহার নিকট সুখ ব্যক্ত করিলে সুখ দ্বিগুণিত হয়, তাঁহার স্পর্শসুখে যে কি আনন্দ তাহা কে প্রকাশ করিবে? অতএব সর্ব্বাপেক্ষা ঈশ্বরই আমাদের সাধু সখা। তাঁহাকে যেন আমরা পরিত্যাগ না করি—আর তাঁহার পদানত সাধু ভক্তের সঙ্গসুখে বঞ্চিত না হই। ইহাই এই মোহময় ভবার্ণবের পর পারে উত্তীর্ণ হইবার এক মাত্র পথ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

—

অদ্বৈত মতের দ্বিতীয় সমালোচনা।

আমার পূর্ব্বকৃত অদ্বৈত মতের সমালোচনা পাঠ করিয়া একজন শ্রদ্ধেয় প্রাচীন দর্শনবিশারদ পণ্ডিত তৎসম্বন্ধে আমাকে তাঁহার মনের কথা অতীব সরল ভাবে খুলিয়া বলিয়াছেন—সে কথা এই ঃ—

"অদ্বৈতবাদিরা ব্রহ্ম হইতে চাহেন, এরূপ যাহারা বুঝে, তাহারা অদ্বৈতবাদের মর্ম্মজ্ঞ নহে—বিচার-মল্ল মাত্র। অদ্বৈতবাদীর মনের ভিতরে যে কথা থাকে তাহার একটি কথা এই

'সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্তং।
সামুদ্রোহি তরঙ্গো ন সমুদ্রস্তারঙ্গঃ॥'

ভেদ তিরোহিত হইলেও আমি তোমারই পরন্তু আমার তুমি নহ; সমুদ্রেরই তরঙ্গ—সমুদ্র তরঙ্গের নহে।"

এই উদ্ধৃত শ্লোকটির ভাবার্থ এই যে তরঙ্গোপম জীবাত্মা সমুদ্রোপম পরমাত্মার সহিত ঘনিষ্ট ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইলেও 'সমুদ্র ব্যাপক এবং তরঙ্গ ব্যাপ্য—পরমাত্মা পূর্ণ এবং জীবাত্মা অপূর্ণ' এই যে দ্বৈতভাব, ইহা অপরিহার্য্য। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে এই যে, অদ্বৈতবাদের ভিতরের কথা ব্যক্ত করিলেই তাহা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ হইয়া পড়ে। একদিকে প্রাচীন অদ্বৈতবাদী এইরূপ সুস্পষ্ট বচনে আমার অভিপ্রেত দ্বৈতাদ্বৈত মতের পোষকতা করিয়াছেন; আর এক দিকে একজন নব্য অদ্বৈতবাদী* আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া অজ্ঞাতসারে আমারই ঐ মতের সপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। ইনি বলিয়াছেন

"দ্বিজেন্দ্র বাবু যাহাকে পরব্রহ্মে বিলীন হওয়া বলিয়াছেন, অদ্বৈতবাদীরা তাহাকেই প্রকৃত আত্মলাভ বলিয়া থাকেন।"

নব্য প্রতিবাদী দেখিয়াছেন কিনা বলিতে পারি না—আমি কিন্তু অদ্বৈত মতের প্রতিপাদক প্রধান একটি গ্রন্থে

* শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ সেন এম্ এ বি এল্।

দেখিয়াছি যে, সাধকের জ্ঞান অবিদ্যাকে বিনষ্ট করিয়া সেই সঙ্গে

'স্বয়ং নশ্যেৎ জলে কতকরেণুবৎ'

আপনিও বিনষ্ট হয়—কি প্রকারে ? না যেমন কতক-রেণু (অর্থাৎ নির্ম্মলী) জলের ময়লা বিনষ্ট করিয়া সেই সঙ্গে আপনিও বিনষ্ট হয়।

অদ্বৈতবাদীর এই 'বিনষ্ট হওয়া' অথবা 'বিলীন হওয়া' কথাটি প্রতিবাদীর মনঃপূত না হওয়াতে তিনি বিলীন হওয়াকে বিলীন হওয়া না বলিয়া আত্মলাভ বলিতে ইচ্ছা করিতেছেন। প্রতিবাদীর মন বলিতেছে যে, বিলীন হইবার বাসনা অদ্বৈতবাদের একটি ক্ষতস্থান, তাই তিনি আত্মলাভ-শব্দের পটি দিয়া সেই ক্ষতস্থানটি আবরণ করিবার জন্য সমুৎসুক। প্রতিবাদী এক কারণে বিলীন হওয়াকে বিলীন হওয়া বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন, আমি আর এক কারণে বিলীন হওয়াকে আত্ম-লাভ বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছি। আমার পক্ষের কারণ এই যে, গোড়া হইতে আমার মনে এইরূপ একটা সংস্কার বদ্ধমূল আছে যে, বিলীন হওয়ার অর্থ আপনাকে লাভ করা নহে—বিলীন হওয়ার অর্থ আপনি লয় প্রাপ্ত হওয়া। প্রতিবাদী বলিতেছেন যে বিলীন হওয়ার অর্থ আত্ম-লাভ। তবে তাই সই! কিন্তু আমি আত্ম-লাভের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলি নাই;—বাদী যাহা বলে নাই, প্রতিবাদী কোমর বাঁধিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন, ইহারই নাম বাতাসের সহিত যুদ্ধ করা। আমি আত্ম-লাভের বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক, কোনো নব্য বৈদান্তিক যদি সভাসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বলেন যে, ব্রহ্মের সহবাসে নবজীবন পাইয়া আত্মলাভ করাই সাধকের মুখ্য সংকল্প, তবে আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রীতিগদ্‌গদ চিত্তে তাঁহার সহিত আনন্দে হস্তালোড়ন করিব—বলিব 'কে বলিল তুমি আমার প্রতিপক্ষ—তুমি আমার পরম আত্মীয়।'

আমার পূর্ব্বকৃত সমালোচনার উপসংহার ভাগে আমি আমার স্বমতের তিনটি বিভিন্ন অবয়ব ভাগ ভাগ করিয়া প্রদর্শন করিয়াছি। তাহার প্রথম দুইটি (অদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতবাদ) আমার মতের অসম্পূর্ণ অবয়ব, তৃতীয়টি (দ্বৈতাদ্বৈতবাদ) আমার মতের পূর্ণাবয়ব। অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈতবাদই আমার সমগ্র মত; প্রকৃত প্রস্তাবে আমি দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। তা ছাড়া, অদ্বৈত-বাদ যে অংশে দ্বৈতাদ্বৈতের অঙ্গীভূত, সেই অংশে আমি অদ্বৈতবাদী; দ্বৈতবাদ যে অংশে দ্বৈতাদ্বৈতের অঙ্গীভূত সেই অংশে আমি দ্বৈতবাদী। যে অদ্বৈতবাদ এবং যে দ্বৈতবাদ—দ্বৈতাদ্বৈত-হইতে বিচ্ছিন্ন, তাহা যোদ্ধার ছিন্ন-হস্তের ন্যায় নির্জ্জীব শুষ্ক এবং অকর্ম্মণ্য। কেহ বলিতে পারেন যে, 'তোমার অভিপ্রেত মত দেখিতেছি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—তাহা না বলিয়া তুমি বলিতেছ 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ,' ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছু না—আমার বিবেচনায়, বিশিষ্টাদ্বৈতের মধ্যে দ্বৈত এবং অদ্বৈত দুইই সম্ভুক্ত রহিয়াছে এ কথা সাধারণ পাঠকের অনেকে হয়তো না জানিতে পারেন এই আশঙ্কার বশবর্ত্তী হইয়া প্রতিপদে পাঠককে ঐ কথাটি স্মরণ করাইয়া দেওয়া অপেক্ষা বিশিষ্টাদ্বৈতের পরিবর্ত্তে দ্বৈতাদ্বৈত শব্দ ব্যবহার করাই সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ। তাহাতে কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, যেহেতু আমি আমার পূর্ব্বকৃত সমালোচনার পরিশিষ্ট ভাগে

দ্বৈতাদ্বৈত ভাবের তাৎপর্য্য সবিশেষ বিবৃত করিয়া বলিয়াছি; এইরূপ বলিয়াছি যে, একটা কাচের পাত্রে তেল আর জল একত্রে স্থাপন করিলে দুয়ের মধ্যস্থলে একটা চক্রাকৃতি রেখা সকলেরই প্রত্যক্ষগোচর হয়। সে রেখাটিকে জলরেখা বলিব, কিম্বা তৈলরেখা বলিব? তেলের দিক্ দিয়া দেখিলে তাহা তৈলরেখা, জলের দিক্ দিয়া দেখিলে তাহা জলরেখা। চক্রাকৃতি রেখাটি যেমন তেল আর জলের মধ্যবর্ত্তী, কার্য্যোৎপাদিকা শক্তি সেইরূপ কার্য্য এবং কারণের মধ্যবর্ত্তী। কারণের দিক্‌দিয়া দেখিলে তাহা কারণ, কার্য্যের দিক্ দিয়া দেখিলে তাহা কার্য্য। এই জন্য উৎপাদিকা শক্তি কারণের সহিত এক হিসাবে অভিন্ন, আর এক হিসাবে বিভিন্ন। তাহা অভিন্ন হইয়াও বিভিন্ন। প্রাচীন দর্শনকার দেখিলেন যে, 'অভিন্ন হইয়াও বিভিন্ন' এ কথাটা মুখে বলিবার সময় স্ববিরোধী শুনায় বটে, অথচ উহার যাথার্থ্য কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না—পারিবেন না; ইহা দেখিয়া তিনি শক্তির নাম দিলেন 'অব্যপদেশ্য'। 'অব্যপদেশ্য' কিনা যাহা আপনার মনে আপনি বুঝা যায় কিন্তু অন্যকে উপদেশ করা যায় না—ভাবিয়া বুঝা যায় কিন্তু বলিয়া বুঝানো যায় না। অতএব শক্তি এবং শক্তিমানের মধ্যে ভেদাভেদ স্বীকার করিতেই হইবে। উভয়ের মধ্যে যে হিসাবে ভেদ নাই. সে হিসাবে পরমাত্মাতে কোনো জাতীয় ভেদই নাই—স্বজাতীয় ভেদ নাই—বিজাতীয় ভেদ নাই—স্বগত ভেদ নাই; যে হিসাবে উভয়ের মধ্যে ভেদ আছে, সে হিসাবে পরমাত্মাতে সকল প্রকার ভেদই আছে; তাহার সাক্ষী—জড়জগতের সহিত ঈশ্বরের বিজাতীয় ভেদ; চিৎজগতের সহিত তাঁহার স্বজাতীয় ভেদ; আপনার সর্ব্বশক্তিমত্তা এবং সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি তটস্থ লক্ষণ সকলের সহিত তাঁহার স্বগত ভেদ।

প্রতিবাদী যখন বিলীন হওয়াকে আত্মলাভ করিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারেন, তখন তিনি পঞ্চদশীর নির্গুণ অদ্বৈতবাদকে হেগেলের মতানুযায়ী দ্বৈতাদ্বৈতবাদ করিয়া প্রতিপন্ন করিবেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তিনি পঞ্চদশীর

"পরমাত্মাদ্বয়ানন্দঃ পূর্ণঃ পূর্ব্বং স্বমায়য়া।
স্বয়মেব জগদ্ভূত্বা প্রাবিশৎ জীবরূপতঃ॥"

এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া তাহার এইরূপ অর্থ করিতেছেন যে, 'অদ্বয়ানন্দ পরমাত্মা স্বমায়া দ্বারা পূর্ণ হইয়া স্বয়ংই জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হইলেন।' এ কথাটি কোন্ দেশের কোন্ শাস্ত্রের কথা তাহা জানি না কিন্তু ঐ শ্লোকের টীকাতে এইরূপ লিখিত আছে যে,

'পূর্ব্বং, সৃষ্টেঃ প্রাক্, * * * * পরিপূর্ণঃ পরাত্মা স্বমায়য়া, * * * স্বনিষ্ঠয়া মায়াশক্ত্যা, স্বয়মেব জগদ্ ভূত্বা, স্বয়মেব জগদাকারতাং প্রাপ্য, জীবরূপতঃ প্রাবিশৎ।'

অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে পরিপূর্ণ পরমাত্মা আপনার মায়া-শক্তি দ্বারা জগদাকারতা প্রাপ্ত হইয়া জীবরূপে তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। পঞ্চদশী যেখানে বলিতেছেন যে, পূর্ণ পরমাত্মা মায়াদ্বারা জগদাকারতা প্রাপ্ত হইলেন, প্রতিবাদী সেখানে বলিতেছেন 'পরমাত্মা মায়া-দ্বারা পূর্ণ হইয়া জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হইলেন। পঞ্চদশীর শ্লোকের এইরূপ অর্থান্তর ঘটাইবার তাৎপর্য্য কি আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আর তিনি পঞ্চদশীর ঐ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক ছত্র শ্লোক যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার

সহিত হেগেলের Thesis (স্থাপন), Antithesis (প্রতিযোগ), এবং Synthesis (সমন্বয়) এই তিন পক্ষের কি যে প্রসক্তি তাহাও আমি বুঝিতে পারিলাম না। তিনি বলিতেছেন, 'অদ্বয়ানন্দরূপ পরমাত্মা, এটা thesis; স্বমায়া দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া স্বয়ংই জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হইলেন, এটা Antithesis। সেই জীব ভেদ-দৃষ্টি দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া বহুজন্ম ভজনা করে; এবং পরিশেষে বহুজন্মসঞ্চিত সাধনপরিপাকবলে তাহার আত্মবিচারে প্রবৃত্তি হয়; ক্রমে আত্মবিচার দ্বারা মায়াকৃত ভেদদৃষ্টি নিরুদ্ধ হইলে অভেদদৃষ্টি প্রতিপন্ন হয়, এটা Synthesis।'(!)। প্রকৃত কথা এই;—

অদ্বৈতবাদীর মতে দার্শনিক বিচার-পদ্ধতির দুইটি পক্ষ—পূর্ব্ব পক্ষ এবং সিদ্ধান্ত পক্ষ। হেগেলের মতে দার্শনিক বিচার-পদ্ধতির তিনটি পক্ষ—স্থাপন পক্ষ, প্রতিযোগ পক্ষ, এবং সমন্বয়-পক্ষ। অদ্বৈতবাদী বিবেক দ্বারা পূর্ব্ব পক্ষের সদসদাত্মক (অর্থাৎ সত্য মিথ্যা জড়িত) বচন হইতে তাহার অসদংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সদংশ গ্রহণ করেন এবং তাহাই সিদ্ধান্ত-পক্ষে প্রতিষ্ঠিত করেন। হেগেল স্থাপন-পক্ষ এবং প্রতিযোগ পক্ষ উভয়েরই স্বাতন্ত্র্য খণ্ডন করিয়া উভয়ের অন্যোন্যাশ্রয়তা (অর্থাৎ পরস্পরাধীনতা) প্রতিপাদন করেন, এবং উভয়াত্মক তৃতীয় সত্য সমন্বয়-পক্ষে প্রতিষ্ঠিত করেন। অদ্বৈতবাদীর অদ্বৈত—সমস্ত দ্বৈত ছাঁটিয়া ফেলিয়া অদ্বৈত; হেগেলের অদ্বৈত—সমস্ত দ্বৈত আত্মসাৎ করিয়া অদ্বৈত। অদ্বৈতবাদীর অদ্বৈত নিগুর্ণ অদ্বৈত—নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত—নিছক অদ্বৈত। হেগেলের অদ্বৈত সগুণ অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত (অর্থাৎ দ্বৈতগর্ভ অদ্বৈত)। অতএব ইহা স্থির যে, অদ্বৈতবাদের পক্ষ সমর্থন হেগেলের চরম উদ্দেশ্য নহে—হেগেলের চরম উদ্দেশ্য দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়। প্রতিবাদীকে একদিকে যেমন আমরা দোষ দিই আর একদিকে তেমনি আমরা সাধুবাদ দিই। দোষ দিই এই জন্য যে, তিনি অদ্বৈতবাদের স্কন্ধে হেগেলের দ্বৈতাদ্বৈত মত চাপাইতে (নিরীহ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গাত্রে হ্যাট্ কোটের বোঝা চাপাইতে) চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহাকে সাধুবাদ দিই এই জন্য যে, তিনি দ্বৈতাদ্বৈত মতের পটি দিয়া অদ্বৈতবাদের ক্ষতস্থান আবরণ করিবার জন্য তৎপর হওয়াতে আপনার দয়ার্দ্রচিত্তের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। হেগেলীয় দর্শনের লোহার কড়াই ভাজা চিবানো হেগেলকেই পোষায়—আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের পাঠকবর্গের ভোজনার্থে সেই রাক্ষসের খোরাক পরিবেষণ করিয়া আমি তাঁহাদের আর অধিক অপ্রীতি-ভাজন হইতে ইচ্ছা করি না। নিতান্ত যেখানে উল্লেখ না করিলেই নয় সেইখানে কান্ট্ এবং হেগেলের কথা একটু আধটু উল্লেখ করিব। প্রথমে অদ্বৈতবাদীর মতানুযায়ী আত্মজ্ঞানের প্রকরণ-পদ্ধতি, সাধারণ পাঠকের বোধোপযোগী করিয়া যত সহজে পারি, প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিতেছি।

মনে কর আমি চাসা ছিলাম, রাজা হইলাম। আমার বুদ্ধিকৃত যোগ-প্রণালী দ্বারা আমিত্বের সঙ্গে রাজত্বের ভাব সংযোজিত হইয়া 'আমি রাজা' এইরূপ জ্ঞান আমার অন্তঃকরণে উদ্বোধিত হইল। এখন বক্তব্য এই যে, এইরূপ রাজাভিমানী অহংজ্ঞান আত্মজ্ঞান শব্দের বাচ্য নহে। আমিত্ব × রাজত্ব এই যে গুণীকরণ বা গুণ-যোজনা, ইহা বুদ্ধি দ্বারা কৃত

হইয়াছে—সুতরাং ইহা বুদ্ধির ফল-স্বরূপ। কিন্তু আত্মা বুদ্ধির মূল স্বরূপ। আমিত্ব×রাজত্ব এইরূপ যুক্তি (কিনা যোজনা-ক্রিয়ার ফল) অন্তঃকরণে ফলিত হইলে তাহার নাম আমরা দিই 'অহংকার বা অহংকৃতি।' 'অহঙ্কৃতি' অর্থাৎ করিয়া তোলা অহং—যেমন রাজা-রূপে গড়িয়া তোলা অহং। এ স্থলে কেহ বলিতে পারেন—"আমিত্ব×রাজত্ব" যেন অহঙ্কার হইল—'আমিত্ব×চাসাত্ব' এটাও কি অহঙ্কার?" এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, চাসা বলে 'আমি চাস করি খাই—কারো কোনো তক্কা রাখি না', চোর বলে 'আমি কেমন প্রহরীর চক্ষে ধূলি দিয়া চুরি করিয়াছি', মূর্খ বলে 'বিদ্যা শেখা বৃথা পণ্ডশ্রম, আমি সে দিকে যাই না—আমি অর্থের চেষ্টায় ফিরি'। এই-রূপ দেখা যাইতেছে যে, কর্ত্তৃত্ব-অভিমান অথবা অহংকার কেবল যে বড়লোকের মধ্যেই আবদ্ধ তাহা নহে—সকল শ্রেণীর লোকের অন্তঃকরণেই তাহা ন্যূনাধিক পরিমাণে রাজত্ব করে। অতএব এটা স্থির যে,

আমিত্ব×রাজত্ব এইরূপ গুণ-যোজনা বা গুণীকরণ=অহঙ্কার; আর, তাহার ফল="আমি রাজা" এইরূপ জ্ঞান=অহংজ্ঞান বা অহং প্রত্যয়।

তবেই হইতেছে যে, বুদ্ধিকৃত গুণ-যোজনার সঙ্গে সঙ্গে অহংজ্ঞান অন্তঃকরণে ফলিত হয়। যেমন কাগজের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে প্রস্থের গুণীকরণ ব্যতিরেকে কাগজই হয় না—তেমনি আত্মতত্ত্বের সহিত অপর কোনো একটি তত্ত্বের (যেমন রাজত্বের বা চাসাত্বের) যোগ ব্যতিরেকে অহংজ্ঞান হইতে পারে না। এখন সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে অহংজ্ঞান যৌগিক জ্ঞান যেহেতু তাহা বুদ্ধিকৃত গুণ-যোজনা হইতে উৎপন্ন। অদ্বৈতবাদীরা এইরূপ যৌগিক অহংজ্ঞানকে আভাস-চৈতন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, বুদ্ধিকৃত যোজনা কার্য্যের (বা অধ্যারোপের) ফল-স্বরূপ অহংজ্ঞান বুদ্ধির মূলস্থিত অকৃত্রিম* আত্মজ্ঞানের আভাস-মাত্র—অন্তঃকরণগত প্রতিবিম্ব-মাত্র—তাহা প্রকৃত আত্মজ্ঞান নহে। অদ্বৈতবাদীর মতে প্রকৃত আত্মজ্ঞান যৌগিক (synthetic) নহে, তাহা বৈবেচিক (analytic) অর্থাৎ বিবেক-দ্বারা উৎপাদনীয়। যৌগিক অহংজ্ঞান হইতে রাজত্ব চাসাত্ব পাণ্ডিত্য মূর্খত্ব প্রভৃতি আহঙ্কারিক ডালাপালা ছাঁটিয়া ফেলাই অদ্বৈতবাদের বিবেক-পদ্ধতি। এই বিবেক-পদ্ধতির সোপান অবলম্বন করিয়াই অদ্বৈতবাদী বুদ্ধির এ-পারস্থিত আভাস চৈতন্য হইতে বুদ্ধির ও-পারস্থিত কূটস্থ চৈতন্যে উপনীত হ'ন—বুদ্ধির ফল-স্বরূপ অহংপ্রত্যয় হইতে বুদ্ধির মূলস্থিত আত্মপ্রত্যয়ে উপনীত হ'ন। জর্ম্মান দেশীয় তত্ত্ববিৎ কাণ্ট্ উপরি-উক্ত সমস্ত কথাই স্বীকার করেন; অদ্বৈতবাদী যাহাকে বলেন কূটস্থ চৈতন্য, কাণ্ট্ তাহাকে বলেন Pure self-consciousness অথবা pure apperception; অদ্বৈতবাদী যাহাকে বলেন আভাস চৈতন্য, কাণ্ট্ তাহাকে বলেন empirical self-conciousness; অদ্বৈতবাদী যাহাকে বলেন অন্তঃকরণ, কাণ্ট্ তাহাকে বলেন internal sense। অদ্বৈতবাদী বলেন যে, কূটস্থ চৈতন্য আভাস-চৈতন্যরূপে অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত

* যাহা কৃত—করিয়া তোলা—গড়িয়া তোলা (যেমন আমিত্ব+রাজত্ব=আমি রাজা) তাহারই নাম কৃত্রিম।

হ'ন। কাণ্ট্ বলেন যে, pure self consciousness internal sense-এ empirical self consciousness রূপে প্রতিফলিত হয়। অদ্বৈতবাদী বলেন যে, বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান বিবেকোৎপন্ন (সংক্ষেপে বৈবেচিক); কাণ্ট্ বলেন Pure self consciousness analytic। কাণ্ট্ এবং অদ্বৈত-বাদীর মতে প্রভেদ তবে কি? প্রভেদ আর কিছু না—বৈবেচিক জ্ঞানের প্রতি কাণ্টের মূলেই শ্রদ্ধা নাই—অদ্বৈতবাদীর তাহার প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা। কাণ্ট্ বলেন যে, যৌগিক অহম্প্রত্যয় হইতে রাজত্ব চাসাত্ব পাণ্ডিত্য মূর্খত্ব প্রভৃতি সমস্ত ডালপালা ছাঁটিয়া ফেলিলে অবশিষ্ট থাকে কেবল-মাত্র 'আমি=আমি', 'আত্মা=আত্মা'। আত্মজ্ঞান চতুর্দ্দিকের জঞ্জাল হইতে পরিমার্জ্জিত হইল বটে, কিন্তু তাহার ফল হইল—'ছিল ঢেঁকি হ'ল তুল, কাটিতে কাটিতে নির্ম্মূল'। কেন না বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান অপর কোনো কিছুর সহিত যোগযুক্ত হইয়া অহংজ্ঞান রূপে প্রতিফলিত না হইলে—'আমি' বলিয়া আপনাকে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না, সুতরাং 'আমি=আমি' আর x=x, এ দুয়ের মধ্যে কিছুই প্রভেদ থাকে না। অদ্বৈতবাদী কাণ্টের এ কথা যে, অস্বীকার করেন তাহা নহে; অদ্বৈতবাদী খুবই তাহা স্বীকার করেন—স্বীকার করিয়াও তিনি বলেন যে, বাক্য-মনের অতীত X=Xপ্রাপ্ত হইলে জীব যদি জন্মমৃত্যুর দায় হইতে চিরকালের মত অব্যাহতি পাইতে পারে, তবে তাহাই জীবের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। এ বিষয়ে হেগেল যাহা বলেন তাহা আমি হেগেলীয় চুল-চেরা ভাষায় হেগেলোচিত সূক্ষ্ম-প্রণালীতে বলিতে সাহস করি না; দৃষ্টান্তের ঢু-পুরু কাচের মধ্যদিয়া—মোটামুটি রকমে—ইঙ্গিত ইসারায়—তাহার কথঞ্চিৎ আভাসমাত্র প্রদান করিতেছি। ইহাতে যদি পাঠক সন্তুষ্ট না হইয়া হেগেলের সহিত সবিশেষ পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি হেগেলকে চেনেন না! নিতান্তই যদি তিনি হেগেলের নিজ মূর্ত্তির দর্শনাভিলাষী হ'ন, তবে তিনি দার্শনিক অস্ত্রশস্ত্রে রীতিমত সুসজ্জিত হইয়া হেগেলীয় দর্শন-মহারণ্যের গোলোকধাঁদায় প্রবেশ করুন—কিন্তু যেন সেই নিবিড় মহারণ্যের ভিতরে দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে দ্রুতগতি ফিরিয়া আসিয়া না বলেন 'ত্রাহি মধুসূদন! আমি আর ও দিকে না—তোমার ইচ্ছা হয় তুমি যাও!' মোটামুটি হেগেলের কথার ধরণ এইরূপঃ—

রাজাকে তুমি রাজত্ব-অভিমান ছাঁটিয়া ফেলিতে বলিতেছ—কিন্তু আমি তাহা বলি না। রাজাকে আমি বলি যে, তোমার রাজত্ব-অহঙ্কার পদার্থটা কি তাহা তুমি একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখ। তাহা হইলে দেখিবে যে প্রজা না থাকিলে তুমি রাজা হইতে পার না। প্রজা যদি চাস না করে তবে তোমার রাজত্ব কোথায় থাকে? অতএব তোমার প্রজা যেমন তোমার অধীন—তুমিও তেমনি তোমার প্রজার অধীন। তুমি এবং তোমার প্রজাবর্গ পরস্পরাধীন। তুমি তোমার প্রজাবর্গের প্রভু এটা আংশিক সত্য। সমগ্র সত্য এই যে, তুমি তোমার প্রজার প্রভুও বটে, দাসও বটে। শেষোক্ত সত্যটির উপরেই তোমার স্বাধীনতা নির্ভর করে—যথেচ্ছাচারিতার উপরে নহে। তোমার প্রজা যদি তোমার আপনার হয়, আর তোমার সেই আপ-

নার প্রজার যদি তুমি অধীন হও, তবে তুমি আপনারই অধীন হও—স্বাধীন হও। তোমার হাত যেমন তোমার আপনার—তোমার প্রজাবর্গ তেমনি তোমার আপনার; আর, আপনার হাতের আঙ্গুল যেমন আপনার আঙ্গুল, তেমনি আপনার প্রজাবর্গের অধীনে অবস্থিতি আপনারই অধীনে অবস্থিতি—তাহা স্বাধীনতা, তাহা পরের অধীনে অবস্থিতি নহে—তাহা পরাধীনতা নহে। অতএব তুমি আপনার হাতকে আপনা হইতে বিচ্ছিন্ন করিও না; যথেচ্ছাচার-দ্বারা প্রজাবর্গকে আপনার বক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিও না—তাহাদিগকে পর করিয়া ফেলিও না। স্নেহ-বন্ধন দ্বারা প্রজাবর্গকে আপনার করিয়া লও—আপনার করিয়া লইয়া সেই তোমার আপনারই প্রজার অধীন হও, তাহা হইলে তুমি আপনারই অধীন হইবে—স্বাধীন হইবে। স্বাধীনতার অভ্যন্তরে প্রভুত্ব এবং অধীনতা এই দুই বিরোধী পক্ষ প্রেম-সূত্রে গ্রথিত হইয়া একাধারে অবস্থিতি করে—বাঘে গরুতে একত্রে জলপান করে। কেননা 'আপনি আপনার অধীন' বলিলেই আপনি আপনার প্রভু বুঝায়—স্বাধীন বলিলেই স্বপ্রভু বুঝায়, স্বাধীনতার অভ্যন্তরে প্রভুত্ব এবং অধীনতা উভয়ে সদ্ভাবে মিলিয়া মিশিয়া একত্রে বাস করে। * মনে কর একজন নবাভিষিক্ত যুবরাজ হেগেলের এই অমাত্যোচিত সৎপরামর্শ হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। হেগেল বলিলেন, 'কাঙ্গালের কথা বাসী হইলেই ফলে' এই বলিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন। যুবরাজ আপনার নবাধিকৃত সিংহাসনের সুকোমল পৃষ্ঠাস্তরণে হেলান দিয়া "আমি মহারাজাধিরাজ" এইরূপ অহংকারে স্ফীত হইলেন—স্ফীত হইয়া যথেচ্ছার আরম্ভ করিলেন। রাজ্যের স্থানে স্থানে প্রজা-বিদ্রোহের পূর্ব্ব লক্ষণ দেখা দিতে লাগিল। রাজার মনে ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল। এক দিন রাজার সভাপণ্ডিত কথকের বেদীতে আসীন হইয়া রাম রাবণের যুদ্ধের উপসংহার ভাগ বর্ণন করিতে করিতে প্রসঙ্গ-ক্রমে বলিলেন

'অতি দর্পে হতা লঙ্কা অতি মানে চ কৌরবাঃ।'

সে রাত্রে রাজার নিদ্রা হইল না। তিনি শয্যায় পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন—"প্রজাবর্গ আমাকে যথেষ্ট কর প্রদান করে,

* উল্লিখিত দৃষ্টান্তটির মধ্যে একটি গভীর দার্শনিক তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। মনে কর আমি একটি বনকে উদ্যান-রূপে পরিণত করিতে সংকল্প করিলাম; আর, সেই সংকল্পের বশবর্ত্তী হইয়া লোক জন সমভিব্যাহারে বনাভিমুখে চলিলাম। এরূপ অবস্থায়, আমার সঙ্কল্পিত উদ্যান, যাহা ভবিষ্যতে বাস্তবিকরূপে ফলিত হইবে কিন্তু এখন কাল্পনিক মাত্র, তাহা আমাকে বনাভিমুখে চালনা করিতেছে। তবেই হইল যে, আমি আমার আপনারই সংকল্পিত উদ্যান-দ্বারা চালিত হইতেছি—আপনারই কল্পনা দ্বারা চালিত হইতেছি;—যখন আপনারই কার্য্য দ্বারা চালিত হইতেছি—তখন আমি আপনারই অধীন—স্বাধীন। যদি আমি পুষ্প-সৌরভের আকর্ষণে দিক্‌বিদিক্ শূন্য হইয়া বনাভিমুখে চলিতাম তবে আমি পরাধীন হইতাম। তাহার মধ্যে একটি কথা আছে—আমার উদ্যান-কল্পনা সর্ব্বাংশে মৌলিক নহে; তাহা পূর্ব্বদৃষ্ট উদ্যানের আংশিক অনুকরণ। সুতরাং উদ্যান-কল্পনা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যদিও আমার আপনার কার্য্য কিন্তু পরোক্ষ-সম্বন্ধে তাহা প্রকৃতির কার্য্য, এই জন্য আমরা বলি যে মনুষ্য যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বাধীন, তেমনি পরোক্ষ-সম্বন্ধে পরাধীন; তা বই, মনুষ্য সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন নহে। আমার উদ্যান-কল্পনা কতক অংশে প্রকৃতির অনুকরণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টি অন্য কোনো কিছুর অনুকরণ নহে—তাহা একটি পরমাশ্চর্য্য মৌলিক ব্যাপার; ঈশ্বর কোনো অংশেই পরের অধীন নহেন—তিনি সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন। স্বাধীনতা-শব্দের অর্থ আপনার অধীনতা self-determination। কিন্তু freedom শব্দের মুখ্য অর্থ অনধীন মুক্তভাব। অনধীন মুক্তভাব হইতে কোনো কার্য্যই উৎপন্ন হইতে পারে না। আপনার অন্তর্নিহিত ভাবের এবং আপনার নিয়মের অধীন হইয়া কার্য্য করা'র নামই স্বাধীন-ভাবে কার্য্য করা। আর একটি কথা

প্রজাবর্গকে আমারও কিছু দেওয়া উচিত—রঘুবংশে পড়িয়াছি

'সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ'।

সহস্রগুণ বর্ষণ করিবার জন্য সূর্য্য পৃথিবী হইতে রসাকর্ষণ করে। এ-হেন বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি প্রজার হিতসাধন কার্য্যে—জন-সাধারণের সেবা-কার্য্যে—তৎপর হইলেন। এইরূপে তিনি রাজা হইয়াও বিবেক-দ্বারা আপনার প্রভুত্ব-অহঙ্কার হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া জন-সাধারণের দাসত্ব স্বীকার করিলেন। ইহাই হেগেলের বিবেক পদ্ধতি! রাজা একদা প্রভূত রাজ-কার্য্য-ভারে অবসন্ন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, প্রজাবর্গের আমি কি এতই ক্রীতদাস যে, আমি তাহাদের সেবায় জীবন অবসান করিব! এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে হেগেল-মন্ত্রীর সে দিনকার কথা তাঁহার স্মরণাভ্যন্তরে আবির্ভূত হইল। তিনি ভাবিলেন যে, আমার প্রজা আর কাহারো প্রজা নহে, আমারই প্রজা। তবে আমি তাহাদিগকে আপনার না ভাবিয়া পর ভাবি কেন? আমার হাতের আঙ্গুল যেমন আমার আপনারই আঙ্গুল, তেমনি আমার প্রজাবর্গের সেবা আমার আপনারই সেবা, তাহা পরের সেবা নহে। আপনার প্রজাবর্গের সেবা করিলে আমি আপনারই সেবা করি—আপনি আপনার সেবক হই—আপনি আপনার অধীন হই, স্বাধীন হই। প্রজাও তেমনি মনে করুক্ যে, আমার আপনার হাতের আঙ্গুল যেমন আমার আপনারই আঙ্গুল, তেমনি আমার আপনার রাজার অধীনে অবস্থিতি আপনারই অধীনে অবস্থিতি—পরের অধীনে অবস্থিতি নহে; তাহা স্বাধীনতা—তাহা পরাধীনতা নহে। প্রত্যেক মনুষ্য তেমনি মনে করুক্ যে, আমার প্রতিবাসী আমার আপনারই ভ্রাতা—আপনার ভ্রাতার সেবা করিলে আপনারই সেবা করা হয়, তা'বই পরের সেবা করা হয় না; সুতরাং তাহাতে স্বাধীনতাই প্রকাশ পায়—পরাধীনতা প্রকাশ পায় না। এইরূপ ভাবিয়া রাজা যথেচ্ছাচারি প্রভুত্বের সিংহাসন হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক দাসত্বের বিনীত সোপানের মধ্য-দিয়া স্বাধীনতার দিব্য-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। স্বাধীনতা শুধু কেবল প্রভুত্ব নহে—শুধু কেবল অধীনতাও নহে; তাহা প্রভুত্ব এবং অধীনতা দুয়ের সমন্বয় হইতে উৎপন্ন 'যোগিন স্তৃতীয়ঃ পন্থা'; তাহার সাক্ষী—আপনি আপনার অধীন—আপনি আপনার প্রভু। ইহাই হেগেলের সমন্বয়-পদ্ধতি। সমন্বয়-পদ্ধতি অনুসারে, প্রভুত্বরূপী বর এবং অধীনতা-রূপিণী কন্যা

আছে—সেটি ধর্ম্মের অতীব একটি নিগূঢ় তত্ত্ব; সুতরাং এখানে অল্পের মধ্যে তাহার যৎসামান্য আভাস-মাত্র প্রদর্শন করাই সম্ভবে। সে কথাটি এই:—আমি যখন জানিতেছি যে, আমি সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন নহি তখন সেই সঙ্গে এটাও জানিতেছি যে, ঈশ্বর সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন; জানিতেছি যে, আমার পরিমিত স্বাধীনতা ঈশ্বরের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিবিম্ব-স্বরূপ। সাধক ঈশ্বরের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগী হইয়া আপনার প্রবৃত্তি-দমন পূর্ব্বক ধর্ম্মপথে চলিলে তাঁহার স্বাধীনতা উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে বিকসিত হইয়া ঈশ্বরের স্বাধীনতার নিকটবর্ত্তী হয়; আর যতই নিকটবর্ত্তী হয়, ততই ধর্ম্মসাধন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতিরূপে পরিণত হয়। একজন তার্কিক এস্থলে বলিতে পারেন যে, সমস্ত জগৎই যখন বাধ্যবাধকতার অধীন, তখন ঈশ্বরও যে সেরূপ নহেন তাহার প্রমাণ কি? ইহার উত্তর এই যে, যেখানে দুই বস্তু পরস্পরের বাহিরে অবস্থিতি করে সেইখানেই উভয়ের মধ্যে বাধ্যবাধকতার নিয়ম খাটে; পৃথিবী এবং সূর্য্যের মধ্যে বাধ্যবাধকতার নিয়ম খাটে। কিন্তু সমস্ত জগৎ যখন ঈশ্বরের ঐশী শক্তির উদ্ভাবনা—ঈশ্বরের বাহিরে যখন কিছুই নাই—তখন তাহা হইতেই আসিতেছে যে, ঈশ্বর কোনো প্রকার বাধ্যবাধকতার অধীন নহেন—ঈশ্বর সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন। আধ্যাত্মিক তত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য যৎকিঞ্চিৎ যাহা আমি অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছি তাহাই সহৃদয় পাঠকবর্গের সহিত আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য—বাদ-প্রতিবাদ কেবল একটা উপলক্ষ মাত্র; তাই আমি টিপ্পনী-চ্ছলে স্বাধীনতা সম্বন্ধে এতগুলি কথা বলিলাম।

বিবাহ-সূত্রে গ্রথিত হইলে সেই শুভ বিবাহের ফল হয় এইরূপ ;—অধীনতার সংশ্লেষে প্রভুত্বের অযথা-অহঙ্কার ঘুচিয়া যায়, আর, প্রভুত্বের সংশ্লেষে অধীনতার অযথা দৈন্য ঘুচিয়া যায় ; এই প্রকারে প্রভুত্ব এবং অধীনতা উভয়ে সুসংস্কৃত এবং সুসংযুক্ত হইয়া স্বাধীনতায় পরিণত হয়। পাঠক নিম্নে অবলোকন করুন্‌ঃ—

(১) আমিত্ব × প্রভুত্ব = আমি সর্ব্বেসর্ব্বা = অযথা অহঙ্কার।

(২) আমিত্ব × অধীনতা = আমি কিছুই নহি = অযথা অহংশূন্যতা।

(৩) আমিত্ব × অধীনতা × প্রভুত্ব = আমি আপনার অধীন = আমি আপনার প্রভু = স্বাধীনতা।

প্রথমটি অবিবেক-প্রধান অহঙ্কার ; ইহা হেগেলের স্থাপন-পক্ষের অধিকারে, এবং অদ্বৈতবাদীর পূর্ব্বপক্ষের অধিকারে, অবস্থিতি করে।

দ্বিতীয়-টি বিবেক-প্রধান অহংশূন্যতা ; ইহা হেগেলের প্রতিযোগপক্ষের অধিকারে, এবং অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত-পক্ষের অধিকারে, অবস্থিতি করে।

তৃতীয়টি যোগ-প্রধান স্বাধীনতা ; ইহা হেগেলের সমন্বয়পক্ষের অধিকারে অবস্থিতি করে ; তদ্ব্যতীত অদ্বৈতবাদীর কোনো পক্ষেই অধিকার পায় না।

বিবেক-শব্দের গায়ে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে যে, তাহা বিবেচনা-ক্রিয়ার ফল ; আর, আমরা যাহাকে সমন্বয় অর্থে গ্রহণ করিতেছি সেই যোগ-শব্দের গায়ে লেখা আছে যে, তাহা যুক্তি-ক্রিয়ার ফল। অবিবেক হইতে গাত্রোত্থান করিবার সময়ে রাজার সেই-যে মনে হইয়াছিল যে, আমি আবার প্রভু কিসের—আমি প্রজাবর্গের অধীন ভৃত্য, সেটা তাঁহার বিবেচনা-কার্য্য, এবং তাহার ফল বিবেক। তাহার পরে রাজার মনে এই যে এক নূতন ভাব উপস্থিত হইল যে, আমি প্রভুত্ব-অহঙ্কারে জলাঞ্জলি দিয়াও প্রভুত্বে বঞ্চিত হইতেছি না ; যেহেতু প্রজাবর্গ আমার আপনার—আমি আপনারই প্রজার অধীন —আপনারই অধীন, আপনি আপনার অধীন—আপনি আপনার প্রভু, প্রভুত্ব এবং দাসত্ব আমাতে নির্ব্বিরোধে অবস্থিতি করিতেছে—এটা হ'চ্চে তাঁর যুক্তি-কার্য্য ; আর, যুক্তি-কার্য্যের (অর্থাৎ অগ্র-পশ্চাৎ যোজনা-কার্য্যের) ফল যোগ বা সমন্বয়। অতএব এটা স্থির যে, হেগেলের অভিপ্রায়ানুযায়ী যোগাত্মক স্বাধীন আত্মা, অদ্বৈতবাদীর বিবেকাত্মক X = X নহে। প্রতিবাদীর ন্যায় যাঁহারা যোগাত্মক স্বাধীন আত্মা এবং বিবেকাত্মক X = X, এদুয়ের মধ্যে প্রভেদ দেখিয়াও দেখেন না, যাঁহারা বিলীন হওয়াকেই আত্ম-লাভ মনে করেন, তাঁহাদের অযৌক্তিকতা-সম্বন্ধে Professor Andrew seth এইরূপ বলিয়াছেন "Comment would but weaken the audacious irony of phrases which make accomplishment tantamount to disappearence, and interpret 'gift' of personality as meaning the 'dissipation' of personality."

পঞ্চদশীতে ভাগত্যাগ-লক্ষণা-দ্বারা আত্মজ্ঞানে উপনীত হইবার যেরূপ প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা দেখিবা মাত্র পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, তাহা নিতান্তই একরোখা বিবেক-পদ্ধতি—তাহার মধ্যে সমন্বয়-পদ্ধতির নাম-গন্ধও নাই। যিনি কস্মিন্‌ কালেও কোনো অদ্বৈত-বাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থের মর্ম্মের ভিতরে কিঞ্চিন্মাত্র প্রবেশ করিয়াছেন—নিশ্চয়ই তিনি আমার সহিত একবাক্যে বলিবেন যে, ভাগত্যাগ দ্বারা মায়া এবং অবিদ্যা একবার

পরিত্যক্ত হইলে সেই পরিত্যক্ত অবিদ্যাকে ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তর্ভূত করিয়া লইবার বিধান নিতান্তই নূতন শাস্ত্র। অথচ প্রতিবাদী আমার নাম উল্লেখ করিয়া অম্লানবদনে বলিতেছেন যে, 'তিনি কি জানেন না যে, অদ্বৈতবাদীরাই বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা যে, ভাগত্যাগ দ্বারা ঐক্য প্রদর্শন করিতেছেন সেই পরিত্যক্ত ভাগ সমূহও অন্তর্নিহিত ঐক্যগ্রন্থিরই স্বভাব-সিদ্ধ পরিণাম?" ইহার উত্তরে আমি বলি যে, প্রতিবাদী কি জানেন না যে, অদ্বৈতবাদী সাংখ্যের ন্যায় পরিণামবাদী নহেন? তিনি কি জানেন না যে, অদ্বৈতবাদীর মতে অবিদ্যা জীবাত্মার ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে? তিনি কি জানেন না যে, সেই ভ্রম বিনষ্ট হইলে অবিদ্যাবাদীর মতে আত্মা মুক্তি-লাভ করে? তিনি কি জানেন না যে, পরিত্যক্ত অবিদ্যা মুক্ত আত্মার ত্রিসীমার মধ্যেও ঘেঁসিতে পারে না? তবে তিনি কোন্ যুক্তিতে বলিতেছেন যে, অদ্বৈতবাদীর মতে "পরিত্যক্ত ভাগসমূহ অন্তর্নিহিত ঐক্যগ্রন্থিরই স্বভাব-সিদ্ধ পরিণাম।" প্রতিবাদীর সহিত অনর্থক দ্বন্দ্ব কলহে প্রবৃত্ত না হইয়া দ্বৈতাদ্বৈত সম্বন্ধে আমার মত কিরূপ, আর, স্বদেশীয় শাস্ত্রের সহিত তাহার ঐক্যানৈক্যই বা কিরূপ, তাহা যত সংক্ষেপে পারি, প্রদর্শন করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। *

ঈশ্বর দ্বৈতাদ্বৈত মতের কেন্দ্রস্বরূপ। প্রকৃতি অরাবলী স্বরূপ। সূর্য্যের যেমন করাবলী, কেন্দ্রের তেমনি অরাবলী, আত্মার তেমনি আত্মপ্রভাব, পরমাত্মার তেমনি ঐশীশক্তি। প্রাজ্ঞ জীব-মণ্ডলী পরিধি-স্বরূপ; এবং এক একটি প্রাজ্ঞজীব এক একটি অরের বহিঃপ্রান্ত স্বরূপ †। অরাবলী—কেন্দ্র এবং পরিধির পরস্পর

---

* পঞ্চদশীকার অদ্বৈতবাদের সমস্ত মূল কথাই তাঁহার গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে অতীব পরিষ্কাররূপে উপন্যস্ত করিয়াছেন—সেকথাগুলি এইঃ—(১) জীবাত্মার সচ্চিদানন্দতা। (২) জীব-ব্রহ্মের ঐক্য। (৩) অবিদ্যার প্রভাব। (৪) সৃষ্টি-প্রকরণ। (৫) পঞ্চকোষ-বিবেক। (৬) ভাগত্যাগ লক্ষণা। (৭) শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসন। (৮) ধর্ম্ম-মেঘ সমাধি। (৯) পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান। (১০) অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান। পঞ্চদশীকার তাঁহার গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টি প্রকরণ সম্বন্ধে যাহা চুম্বকাকারে বলিয়াছেন, দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি তাহা সবিস্তরে বিবৃত করিয়াছেন। তেমনি আবার, প্রথম অধ্যায়ে তিনি পঞ্চ-কোষ-সম্বন্ধে যাহা চুম্বকাকারে বলিয়াছেন, তৃতীয় অধ্যায়ে তাহা সবিস্তরে বিবৃত করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি মাত্রেরই মনে হইতে পারে যে, পঞ্চদশীকার তাঁহার গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে যাহা চুম্বকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—পর-পর-বর্ত্তী অধ্যায়ে তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিস্তারিতরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু প্রতিবাদী অম্লান বদনে বলিতেছেন যে, "পঞ্চদশীর 'তত্ত্ববিবেক' নামক প্রথম অধ্যায়ে দ্বিজেন্দ্র বাবু সমস্ত অদ্বৈত মতের একটি পরিষ্কার চুম্বক ছবি পাইলেন এ অতি আশ্চর্য্যের কথা। যদি তাহাই সম্ভব হইত, তবে পঞ্চদশীকার শেষ চতুর্দশ অধ্যায় না লিখিলেও পারিতেন।" কোনো গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে আপনার সমগ্র মন্তব্য কথাটি চুম্বকাকারে উপন্যস্ত করিয়া শেষ চতুর্দশ অধ্যায়ে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সবিস্তরে পরিস্ফুট করিলে তাঁহার সেরূপ কার্য্য বড়-যে-একটা অসম্ভব ব্যাপার তাহা বোধ করি কেহই বলিবেন না। তবে যে, প্রতিবাদী সম্ভবকে অসম্ভব মনে করিতেছেন, তাহা একপ্রকার রজ্জুতে সর্পভ্রম—তাহার মূল কারণ প্রতিবাদ-প্রিয়তা-রূপিণী অবিদ্যা!

† চক্রের পরিবর্ত্তে কুণ্ডলীর অথবা আবর্ত্তের উপমা দিলে আরো ঠিক হইত। কেননা কুণ্ডলীর বেষ্টন-পথের যে কোনো স্থান হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া—একদিক্ দিয়া চলিলে আবর্ত্ত মুখে-পতিত নৌকার ন্যায় উত্তরোত্তর কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী হইতে হয়—আর একদিক দিয়া চলিলে কেন্দ্র হইতে উত্তরোত্তর দূরে পড়িতে হয়। চক্রের বেষ্টন-রেখাস্থিত বিন্দু সকল কেন্দ্র হইতে সমদূরবর্ত্তী, কিন্তু কুণ্ডলীর বেষ্টন-রেখাস্থিত বিন্দু সকলের মধ্যে কেহ বা কেন্দ্র হইতে অধিক দূরে, কেহ বা অল্প দূরে অবস্থিতি করে। এই জন্য জীবগণের উত্তমাধম শ্রেণী-বিভাগ বুঝাইবার পক্ষে কুণ্ডলীর উপমা সবিশেষ উপযোগী। যাহাই হউক্—আমার বর্ত্তমান মন্তব্য কথা বুঝাইবার পক্ষে চক্রের উপমাই যথেষ্ট।

ব্যবধান এবং বন্ধন দুয়েরই সম্পাদক ;— প্রকৃতি একদিকে তমোগুণ দ্বারা জীবের নিকটে ঈশ্বরের ভাব ঢাকিয়া রাখিয়া জীবেশ্বরের মধ্যে ব্যবধান স্থাপন করে, আর একদিকে সত্ত্বগুণ দ্বারা জীবের নিকটে ঈশ্বরের ভাব প্রকাশ করিয়া জীবেশ্বরের মধ্যে বন্ধন ঘনীভূত করে। সাংখ্য-দর্শন কেন্দ্রকে গণনা হইতে বর্জ্জিত করিয়া অরাবলী এবং পরিধির উপরেই সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ; বেদান্ত-দর্শন অরাবলীকে মায়াবোধে তুচ্ছ করিয়া কেন্দ্র এবং পরিধির মধ্যে ব্যবধান একেবারেই বিলুপ্ত করিয়াছেন— ব্যবধান বিলুপ্ত করিয়া জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়কেই নির্গুণ ব্রহ্মে পরিসমাপ্ত করিয়াছেন। সাংখ্যদর্শন একদিকে বলেন যে, জগতের উৎপত্তি স্থিতি লয় সমস্তই অচেতন প্রকৃতির কার্য্য— পুরুষ (জীবাত্মা) উদাসীন সাক্ষী মাত্র। আর এক দিকে বলেন যে, প্রকৃতি এবং পুরুষ লৌহ এবং চুম্বকের মত পরস্পরের সান্নিধ্যবশতঃ পরস্পরের সমধর্ম্মিতার ভাণ করে। সাংখ্যদর্শনের এইরূপ দুইভাবের দুই কথা পরস্পরের বিরোধী। আমি যখন লিখিতেছি তখন আমার চৈতন্যের সান্নিধ্যবশতঃ আমার হস্ত কি ভাণ করে যে, সে নিজে লিখিতেছে ? অন্ধ প্রকৃতি আত্মার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অবগত নহে—"আমি" কাহাকে বলে তাহাও সে জানে না—তবে কেমন করিয়া ভান করিবে যে, আমি দ্রষ্টা ? আর, তুমি যখন বলিতেছ যে, আত্মা উদাসীন সাক্ষী-মাত্র তা ছাড়া আর কিছুই নহে, তখন তুমি আর এ কথা বলিতে পার না যে, প্রকৃতির সান্নিধ্যে বিচলিত হইয়া আত্মা আপনাকে কর্ত্তা মনে করেন। যাহার শরীর নাই তাহাকে অগ্নির উত্তাপ বিচলিত করিবে কিরূপে ? যাহার ক্ষুধা নাই তাহাকে সুস্বাদু অন্নের আঘ্রাণ বিচলিত করিবে কিরূপে ? চুম্বকের সান্নিধ্য-বশতঃ লৌহ যখন বিচলিত হয়, আর কাষ্ঠ যখন বিচলিত হয় না, তখন তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, চুম্বকের প্রতি কাষ্ঠ উদাসীন—লৌহ আসক্ত। চুম্বকের সান্নিধ্যে লৌহ বিচলিত হয় হউক্, কিন্তু কাষ্ঠ কেন বিচলিত হইবে ? অতএব সাংখ্য যাহা বলেন তাহা যদি সত্য হয়—আত্মা যদি একান্তপক্ষেই নির্গুণ নিস্পৃহ নিরভিমানী উদাসীন সাক্ষী-মাত্র হ'ন তবে প্রকৃতির সান্নিধ্য বশতঃ কর্ত্তৃত্বাভিমানে লিপ্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে কোনো প্রকারেই সম্ভব-পর নহে। প্রকৃত কথা এই যে, প্রকৃতি এবং জীবাত্মা উভয়েরই মূলে পরমাত্মার অধিষ্ঠান স্বীকার না করিলে উভয়ে যে, কি-সূত্রে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত তাহার কোন নির্দ্দেশ পাওয়া যাইতে পারে না। অদ্বৈতবাদী, জীবাত্মা এবং প্রকৃতিকে, পরমাত্মার সহিত ভেদাভেদ-সূত্রে গ্রথিত বলিয়া প্রতিপাদন করিতে পারিতেন কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি প্রকৃতিকে একেবারেই নস্যাৎ করিয়াছেন ; এবং সেই-গতিকে জীবাত্মা এবং পরমাত্মাকে একীভূত করিয়া উভয়কে নির্গুণ ব্রহ্মে পরিসমাপ্ত করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদী এক দিকে বলেন যে, ব্রহ্ম নির্গুণ ; আর এক দিকে বলেন যে তিনি মায়ারূপ উপাধিতে অধিরূঢ় হইয়া ঐশীশক্তি দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। নির্গুণ ব্রহ্ম যদি একান্তপক্ষেই শক্তিহীন হ'ন তবে তিনি কিরূপে মায়াতে অধিরূঢ় হইয়া সগুণ ব্রহ্মরূপে বিবর্ত্তিত হইবেন ; আর, যদি

বল যে, গোড়া হইতেই নিগুর্ণ ব্রহ্ম ‘স্বগুণৈ র্নিগূঢ়ং’ আপনার গুণরাশির অভ্যন্তরে নিগূঢ় রহিয়াছেন, তবে প্রকারান্তরে বলা হয় যে গোড়া হইতেই তিনি সগুণ ব্রহ্ম। প্রকৃত কথা এই যে, সগুণ ব্রহ্মই সমগ্র সত্য—নিগুর্ণ ব্রহ্ম বীজ সত্য। এ-পিট ও-পিট দুই পিট লইয়া একটা কাগজ হয়; তাহার মধ্যে আমি যখন এ পিটে লিখিতেছি—তখন এ পিটই দেখিতেছি। কিন্তু তাহা বলিয়া এ কথা বলিতে পারি না যে, এই কাগজের এ পিট আছে কিন্তু ওপিট নাই; কেন না যদি ওপিট না থাকিত তবে এপিটও থাকিত না। ব্রহ্ম সর্ব্বক্ষণই তাঁহার সমস্ত শক্তি-সমন্বিত সগুণ ব্রহ্ম। যদি জগৎ নাও থাকে তথাপি সেই মহাপ্রলয়ের অবস্থাতেও ব্রহ্মকে শক্তিহীন মনে করিতে পারি না—কেননা তখন স্বয়ম্ভূ পরমাত্মা আপনার শক্তিতে আপনি স্থিতি করিতেছেন—এবং তাঁহার সেই আত্মশক্তিতে সমস্ত শক্তিই অন্তর্নিহিত।

সাংখ্য-দর্শন বেদান্ত হইতে পৃথক্ হইয়া ঈশ্বরকে হারাইয়াছেন; বেদান্ত-দর্শন সাংখ্য হইতে পৃথক্ হইয়া ঈশ্বরের শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়াছেন। সাংখ্য এবং বেদান্ত এই দুই দর্শনের দুই বিরোধী মতের সমন্বয় দ্বারা যেরূপ সগুণ দ্বৈতাদ্বৈত বাদে সহজে উত্তীর্ণ হওয়া যাইতে পারে তাহাই আমি এক্ষণে দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি।

সাংখ্য দর্শন মূল প্রকৃতির নাম দিয়াছেন ‘অব্যক্ত’, দৃশ্যমান প্রকৃতির নাম দিয়াছেন ব্যক্ত; সমগ্র প্রকৃতির নাম দিয়াছেন ব্যক্তাব্যক্ত। প্রকৃতির কার্য্য তিনরূপ—ব্যক্ত হওয়া, অব্যক্ত হওয়া, এবং ব্যক্ত হইতে চেষ্টা করা। প্রকৃতির এই তিনটি কার্য্য দ্বারা তাহার তিনটি গুণ সূচিত হয়;—যেহেতু সাংখ্যের মতে কার্য্য এবং কারণ অভিন্ন। ব্যক্ত হওয়া—এই কার্য্য দ্বারা সূচিত হয় যে, প্রকৃতির ভিতরে সত্ত্বগুণ (প্রকাশ-গুণ, সত্তার অভিব্যক্তি-গুণ, বুদ্ধিবৃত্তি) বিদ্যমান আছে; অব্যক্ত হওয়া—এই কার্য্য দ্বারা সূচিত হয় যে.প্রকৃতির অভ্যন্তরে তমোগুণ (প্রকাশের প্রতিবন্ধক—জড়তা—মোহ) বিদ্যমান আছে; অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হইবার চেষ্টা—এই কার্য্য দ্বারা সূচিত হয় যে, প্রকৃতির অভ্যন্তরে রজোগুণ (প্রকাশের চেষ্টা বা প্রবৃত্তি, প্রাণ) আছে। ইহার মধ্যে আমার নিজের কথা একটিও নাই—আদ্যোপান্ত সমস্তই সাংখ্যের কথা। সাংখ্যশাস্ত্র হইতে রজস্তমোগুণ এবং বেদান্তশাস্ত্র হইতে সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরতত্ত্ব আদায় করিয়া দুয়ের সমন্বয় পূর্ব্বক আমি আমার পূর্ব্বকৃত সমালোচনায় বলিয়াছি যে, ঈশ্বর একদিকে যেমন আপনার ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্য জগতে প্রকাশ করিতেছেন, আর একদিকে তেমনি প্রকাশের রাস টানিয়া ধরিয়া রহিয়াছেন। ঐশী-শক্তির প্রকাশ, অপ্রকাশ, এবং বিচেষ্টা, এই তিন অবয়বের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রকারেরা তাহাকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া সংজ্ঞিত করিয়াছেন। জগতে ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকাশের প্রতিবন্ধক অন্য আর কিছুই নহে—সে প্রতিবন্ধক তাঁহার ইচ্ছা-প্রবর্ত্তিত নিয়ম। ‘নিয়ম’ শব্দটি আমি আমার নিজের মন হইতে উদ্ভাবন করি নাই; পাতঞ্জল-দর্শনের সাধন-পাদের ১৮ সূত্রের ভোজরাজকৃত টীকায় এইরূপ স্পষ্ট লিখিত আছে—

প্রকাশঃ সত্ত্বস্য ধর্ম্মঃ (অর্থাৎ প্রকাশ সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম)

ক্রিয়া প্রবৃত্তিরূপা রজসঃ (প্রবৃত্তিরূপা ক্রিয়া রজোগুণের ধর্ম্ম)

স্থিতির্নিয়মরূপা তমসঃ (নিয়মরূপা স্থিতি তমোগুণের ধর্ম্ম) এখন আমার যাহা বক্তব্য তাহা এই ;—

ভূমি হইতে যখন উৎস উৎসারিত হয় তখন তাহাতে ভৌতিক নিয়মের অধীনতাই প্রকাশ পায়। রাজার অহঙ্কার হইতে যখন অত্যাচার উৎসারিত হয়, তখন তাহাতে অবিদ্যারই অধীনতা প্রকাশ পায়। কিন্তু জগতে ঈশ্বরের প্রকাশ-স্ফূর্ত্তি ভৌতিক নিয়মেরও অধীন নহে, অবিদ্যারও অধীন নহে। জগতে ঈশ্বরের প্রকাশ-স্ফূর্ত্তি তাঁহার আপনারই নিয়মের অধীন। ঈশ্বর আপন ইচ্ছায় স্বীয় শক্তি বিচেষ্টিত করিয়া আপনারই নিয়মে আপনার ভাব এবং আপনার অভিপ্রায় জগতে প্রকাশ করিতেছেন। যদি বল যে, ঈশ্বর একমুহূর্ত্তে আপনার সমস্ত ভাব প্রকাশ করেন না কেন? তবে তাহার উত্তর এই যে তিনি কাহার নিকটে তাহা প্রকাশ করিবেন? দ্বিতীয় ঈশ্বরের নিকটে? শরীরের মধ্যে যেমন জীবাত্মা অদ্বিতীয়—সর্ব্ব জগতে তেমনি পরমাত্মা অদ্বিতীয়—সুতরাং দ্বিতীয় ঈশ্বর দ্বিতীয় মহাকাশের ন্যায় অসঙ্গত। তবে কি ঈশ্বর আপনার সমগ্রভাব কোনো জীবাত্মার নিকটে প্রকাশ করিবেন? তাহা হইতে পারে না—যেহেতু ঈশ্বর না হইলে ঈশ্বরের সমগ্রভাব বুঝিতে পারা অসম্ভব। এইজন্য ঈশ্বর জগতে একেবারেই আপনার সমস্ত ভাব প্রকাশ না করিয়া জগৎকে অজ্ঞান হইতে জ্ঞানের দিকে, পাপ হইতে পুণ্যের দিকে, দুর্ব্বিপত্তি এবং অশান্তি হইতে শান্তির দিকে যথাক্রমে এবং যথানিয়মে লইয়া যাইতেছেন। অতএব জগতে অজ্ঞান থাকিবেই, পাপ থাকিবেই, অশান্তি থাকিবেই। কিন্তু আবার, ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা এমনি সর্ব্বজয়ী যে, অজ্ঞানকে দমন করিয়া জ্ঞান উত্তরোত্তর বিকসিত হইবেই—পাপকে দমন করিয়া পুণ্য উত্তরোত্তর বিকসিত হইবেই—নানা প্রকার অশান্তি এবং উপদ্রব দমন করিয়া শান্তি উত্তরোত্তর বিকসিত হইবেই। কেননা ঈশ্বর আপনার ভাব এবং অভিপ্রায় উত্তরোত্তর প্রকাশ করিবার জন্যই আপনার অব্যক্ত শক্তিকে ব্যক্ত জগতে পরিণত করিতেছেন। পৃথিবীতে ঐশ্বরিক ভাবের চরম অভিব্যক্তি কি? না জীবাত্মার বুদ্ধিস্থ জ্ঞানালোক; কেননা জগৎ হইতে জ্ঞানালোক অপসারিত হইলে জগৎ অন্ধকার হইয়া যায়। জ্ঞানালোকের প্রতিবন্ধক কি? না তমোগুণ। তমোগুণ কি? না ঈশ্বরের আপনার ইচ্ছা-প্রবর্ত্তিত নিয়ম—ঈশ্বরের হস্তের রাশ; কেননা ঈশ্বরের প্রকাশ-স্ফূর্ত্তি ঈশ্বরেরই নিয়ম দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে, তা বই, তাহা বাহিরের কোনো প্রতিবন্ধক দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে না। এখন বেস বুঝিতে পারা গেল যে, ঈশ্বরের ঐশীশক্তি ত্রিগুণাত্মিকা শব্দের বাচ্য হয় কেন? ঈশ্বরের শক্তি প্রকাশাত্মিকা, বিচেষ্টাত্মিকা, নিয়মাত্মিকা—তাই ত্রিগুণাত্মিকা।

পঞ্চদশী বলেন যে, ঈশ্বর স্বয়ং মায়াদ্বারা জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া জীবরূপে তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। আর একদিকে আবার তিনি এবং আমাদের দেশের দ্বৈতাদ্বৈত সকল শাস্ত্র একবাক্যে বলেন যে, কর্ম্ম অনাদি। তবেই হইতেছে যে, কর্ম্মীও অনাদি—জীবও অনাদি; যেহেতু কর্ম্মীর আশ্রয় ব্যতিরেকে কর্ম্ম থাকিতে পারে না। অদ্বৈতবাদীর

বল যে, গোড়া হইতেই নিগুর্ণ ব্রহ্ম 'স্বগুণৈ র্নিগূঢ়ং' আপনার গুণরাশির অভ্যন্তরে নিগূঢ় রহিয়াছেন, তবে প্রকারান্তরে বলা হয় যে গোড়া হইতেই তিনি সগুণ ব্রহ্ম। প্রকৃত কথা এই যে, সগুণ ব্রহ্মই সমগ্র সত্য—নিগুর্ণ ব্রহ্ম বীজ সত্য। এ-পিট ও-পিট দুই পিট লইয়া একটা কাগজ হয়; তাহার মধ্যে আমি যখন এ পিটে লিখিতেছি—তখন এ পিটই দেখিতেছি। কিন্তু তাহা বলিয়া এ কথা বলিতে পারি না যে, এই কাগজের এ পিট আছে কিন্তু ওপিট নাই; কেন না যদি ওপিট না থাকিত তবে এপিটও থাকিত না। ব্রহ্ম সর্ব্বক্ষণই তাঁহার সমস্ত শক্তি-সমন্বিত সগুণ ব্রহ্ম। যদি জগৎ নাও থাকে তথাপি সেই মহাপ্রলয়ের অবস্থাতেও ব্রহ্মকে শক্তিহীন মনে করিতে পারি না—কেননা তখন স্বয়ম্ভূ পরমাত্মা আপনার শক্তিতে আপনি স্থিতি করিতেছেন—এবং তাঁহার সেই আত্মশক্তিতে সমস্ত শক্তিই অন্তর্নিহিত।

সাংখ্য-দর্শন বেদান্ত হইতে পৃথক্ হইয়া ঈশ্বরকে হারাইয়াছেন; বেদান্ত-দর্শন সাংখ্য হইতে পৃথক্ হইয়া ঈশ্বরের শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়াছেন। সাংখ্য এবং বেদান্ত এই দুই দর্শনের দুই বিরোধী মতের সমন্বয় দ্বারা যেরূপ সগুণ দ্বৈতাদ্বৈত বাদে সহজে উত্তীর্ণ হওয়া যাইতে পারে তাহাই আমি এক্ষণে দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি।

সাংখ্য দর্শন মূল প্রকৃতির নাম দিয়াছেন 'অব্যক্ত', দৃশ্যমান প্রকৃতির নাম দিয়াছেন ব্যক্ত; সমগ্র প্রকৃতির নাম দিয়াছেন ব্যক্তাব্যক্ত। প্রকৃতির কার্য্য তিনরূপ—ব্যক্ত হওয়া, অব্যক্ত হওয়া, এবং ব্যক্ত হইতে চেষ্টা করা। প্রকৃতির এই তিনটি কার্য্য দ্বারা তাহার তিনটি গুণ সূচিত হয়;—যেহেতু সাংখ্যের মতে কার্য্য এবং কারণ অভিন্ন। ব্যক্ত হওয়া—এই কার্য্য দ্বারা সূচিত হয় যে, প্রকৃতির ভিতরে সত্ত্বগুণ (প্রকাশ-গুণ, সত্তার অভিব্যক্তি-গুণ, বুদ্ধিবৃত্তি) বিদ্যমান আছে; অব্যক্ত হওয়া—এই কার্য্য দ্বারা সূচিত হয় যে প্রকৃতির অভ্যন্তরে তমোগুণ (প্রকাশের প্রতিবন্ধক—জড়তা—মোহ) বিদ্যমান আছে; অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হইবার চেষ্টা—এই কার্য্য দ্বারা সূচিত হয় যে, প্রকৃতির অভ্যন্তরে রজোগুণ (প্রকাশের চেষ্টা বা প্রবৃত্তি, প্রাণ) আছে। ইহার মধ্যে আমার নিজের কথা একটিও নাই—আদ্যোপান্ত সমস্তই সাংখ্যের কথা। সাংখ্যশাস্ত্র হইতে রজস্তমোগুণ এবং বেদান্তশাস্ত্র হইতে সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরতত্ত্ব আদায় করিয়া দুয়ের সমন্বয় পূর্ব্বক আমি আমার পূর্ব্বকৃত সমালোচনায় বলিয়াচি যে, ঈশ্বর একদিকে যেমন আপনার ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্য জগতে প্রকাশ করিতেছেন, আর একদিকে তেমনি প্রকাশের রাস টানিয়া ধরিয়া রহিয়াছেন। ঐশী-শক্তির প্রকাশ, অপ্রকাশ, এবং বিচেষ্টা, এই তিন অবয়বের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রকারেরা তাহাকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া সংজ্ঞিত করিয়াছেন। জগতে ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকাশের প্রতিবন্ধক অন্য আর কিছুই নহে—সে প্রতিবন্ধক তাঁহার ইচ্ছা-প্রবর্ত্তিত নিয়ম। 'নিয়ম' শব্দটি আমি আমার নিজের মন হইতে উদ্ভাবন করি নাই; পাতঞ্জল-দর্শনের সাধন-পাদের ১৮ সূত্রের ভোজরাজকৃত টীকায় এইরূপ স্পষ্ট লিখিত আছে—

প্রকাশঃ সত্ত্বস্য ধর্ম্মঃ (অর্থাৎ প্রকাশ সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম)

ক্রিয়া প্রবৃত্তিরূপা রজসঃ (প্রবৃত্তিরূপা ক্রিয়া রজোগুণের ধর্ম্ম)

স্থিতির্নিয়মরূপা তমসঃ (নিয়মরূপা স্থিতি তমোগুণের ধর্ম্ম) এখন আমার যাহা বক্তব্য তাহা এই ;—

ভূমি হইতে যখন উৎস উৎসারিত হয় তখন তাহাতে ভৌতিক নিয়মের অধীনতাই প্রকাশ পায়। রাজার অহঙ্কার হইতে যখন অত্যাচার উৎসারিত হয়, তখন তাহাতে অবিদ্যারই অধীনতা প্রকাশ পায়। কিন্তু জগতে ঈশ্বরের প্রকাশ-স্ফূর্ত্তি ভৌতিক নিয়মেরও অধীন নহে, অবিদ্যারও অধীন নহে। জগতে ঈশ্বরের প্রকাশ-স্ফূর্ত্তি তাঁহার আপনারই নিয়মের অধীন। ঈশ্বর আপন ইচ্ছায় স্বীয় শক্তি বিচেষ্টিত করিয়া আপনারই নিয়মে আপনার ভাব এবং আপনার অভিপ্রায় জগতে প্রকাশ করিতেছেন। যদি বল যে, ঈশ্বর একমুহূর্ত্তে আপনার সমস্ত ভাব প্রকাশ করেন না কেন? তবে তাহার উত্তর এই যে তিনি কাহার নিকটে তাহা প্রকাশ করিবেন? দ্বিতীয় ঈশ্বরের নিকটে? শরীরের মধ্যে যেমন জীবাত্মা অদ্বিতীয়—সর্ব্ব জগতে তেমনি পরমাত্মা অদ্বিতীয়—সুতরাং দ্বিতীয় ঈশ্বর দ্বিতীয় মহাকাশের ন্যায় অসঙ্গত। তবে কি ঈশ্বর আপনার সমগ্রভাব কোনো জীবাত্মার নিকটে প্রকাশ করিবেন? তাহা হইতে পারে না—যেহেতু ঈশ্বর না হইলে ঈশ্বরের সমগ্রভাব বুঝিতে পারা অসম্ভব। এইজন্য ঈশ্বর জগতে একেবারেই আপনার সমস্ত ভাব প্রকাশ না করিয়া জগৎকে অজ্ঞান হইতে জ্ঞানের দিকে, পাপ হইতে পুণ্যের দিকে, দুর্ব্বিপত্তি এবং অশান্তি হইতে শান্তির দিকে যথাক্রমে এবং যথানিয়মে লইয়া যাইতেছেন। অতএব জগতে অজ্ঞান থাকিবেই, পাপ থাকিবেই, অশান্তি থাকিবেই। কিন্তু আবার, ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা এমনি সর্ব্বজয়ী যে, অজ্ঞানকে দমন করিয়া জ্ঞান উত্তরোত্তর বিকসিত হইবেই—পাপকে দমন করিয়া পুণ্য উত্তরোত্তর বিকসিত হইবেই—নানা প্রকার অশান্তি এবং উপদ্রব দমন করিয়া শান্তি উত্তরোত্তর বিকসিত হইবেই। কেননা ঈশ্বর আপনার ভাব এবং অভিপ্রায় উত্তরোত্তর প্রকাশ করিবার জন্যই আপনার অব্যক্ত শক্তিকে ব্যক্ত জগতে পরিণত করিতেছেন। পৃথিবীতে ঐশ্বরিক ভাবের চরম অভিব্যক্তি কি? না জীবাত্মার বুদ্ধিস্থ জ্ঞানালোক; কেননা জগৎ হইতে জ্ঞানালোক অপসারিত হইলে জগৎ অন্ধকার হইয়া যায়। জ্ঞানালোকের প্রতিবন্ধক কি? না তমোগুণ। তমোগুণ কি? না ঈশ্বরের আপনার ইচ্ছা-প্রবর্ত্তিত নিয়ম—ঈশ্বরের হস্তের রাশ; কেননা ঈশ্বরের প্রকাশ-স্ফূর্ত্তি ঈশ্বরেরই নিয়ম দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে, তা বই, তাহা বাহিরের কোনো প্রতিবন্ধক দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে না। এখন বেস বুঝিতে পারা গেল যে, ঈশ্বরের ঐশীশক্তি ত্রিগুণাত্মিকা শব্দের বাচ্য হয় কেন? ঈশ্বরের শক্তি প্রকাশাত্মিকা, বিচেষ্টাত্মিকা, নিয়মাত্মিকা—তাই ত্রিগুণাত্মিকা।

পঞ্চদশী বলেন যে, ঈশ্বর স্বয়ং মায়াদ্বারা জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া জীবরূপে তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। আর একদিকে আবার তিনি এবং আমাদের দেশের দ্বৈতাদ্বৈত সকল শাস্ত্র একবাক্যে বলেন যে, কর্ম্ম অনাদি। তবেই হইতেছে যে, কর্ম্মীও অনাদি—জীবও অনাদি; যেহেতু কর্ম্মীর আশ্রয় ব্যতিরেকে কর্ম্ম থাকিতে পারে না। অদ্বৈতবাদীর

মতানুসারে ঈশ্বর জগতের অভ্যন্তরে জীব-রূপে প্রবেশ করা'তে তবে তো জীব আবির্ভূত হইল, তাহার পূর্ব্বে তো নয়! তবে আর জীব অনাদি কেমন করিয়া? কিন্তু বাসনা অনাদি, কর্ম্ম অনাদি, জীব অনাদি, এ কথা বলে না এমন শাস্ত্রই আমাদের দেশে নাই। সকল শাস্ত্রই একবাক্যে বলে যে, কর্ম্ম অনাদি সুতরাং জীবাত্মা অনাদি। এইখানে অদ্বৈতবাদীর দুইভাবের দুই কথা ধরা পড়িল :—

(১) ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়া তদভ্যন্তরে জীবরূপে প্রবেশ করিলেন।

(২) ঈশ্বর অনাদিকাল হইতে জীবগণকে কর্ম্মফল বিতরণ করিতেছেন।

কান্টের দর্শনশাস্ত্রে (ঠিক্ এরূপ নহে কিন্তু) ইহারই অনুরূপ একটি দ্বিমুখী তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। কান্ট বলেন যে, মনুষ্যের স্বাধীন পুরুষকার কার্য্য-কারণ প্রবাহের অতীত। কার্য্য-কারণ প্রবাহ এবং কালপ্রবাহ এ পিট ওপিট। সুতরাং মনুষ্যের স্বাধীন পুরুষকার একটি কালাতিগ তত্ত্ব। কিন্তু সেই স্বাধীন পুরুষকার দ্বারা যে কোনো কার্য্য প্রবর্ত্তিত হয় তাহা কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার অন্তঃপাতী সুতরাং তাহা একটি কালাশ্রিত ঘটনা। তাহা যখন কালাশ্রিত ঘটনা তখন তাহার কারণও কালাশ্রিত। তবেই হইতেছে যে, মনুষ্য-কৃত কার্য্যের কারণ দুইরূপ—কালাতিগ পুরুষকার এবং কালাশ্রিত বৈষয়িক প্রবর্ত্তনা। এআমি যদি কজনকে দশ টাকা দান করি —তবে সেই দান কার্য্যের কালাশ্রিত কারণ-পরম্পরা অনন্ত;—প্রথম কারণ আমার হস্ত; তাহার পশ্চাতে দ্বিতীয় কারণ সেই হস্তের পরিচালক ধমনী; তাহার পশ্চাতে তৃতীয় কারণ সেই ধমনীর নিয়ামক মস্তিষ্ক; তাহার পশ্চাতে চতুর্থ কারণ সেই মস্তিষ্কের পরিপোষক অন্ন; তাহার পশ্চাতে পঞ্চম কারণ সেই অন্নের উৎপাদক পৃথিবী, তাহার পশ্চাতে ষষ্ঠ কারণ সেই পৃথিবীর উৎপাদক সূর্য্য—ইত্যাদি। এই গেল দান কার্য্যের কালাশ্রিত কারণ পরম্পরা। তাহার কালাতিগ কারণ একটি বই নয়—কি? না কর্ত্তার পুরুষকার।

প্রকৃত কথা এই যে ঈশ্বর দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বা দশকোটি বৎসর পূর্ব্বে জীব সৃষ্টি করিয়াছেন, এরূপ প্রশ্নের বিশেষ কোনো সার্থকতা নাই; কেননা দশ কোটি বৎসরই বল, আর, সহস্র কোটি বৎসরই বল—ব্রহ্মার তাহা এক দিনও নহে—এক পলও নহে—এক মুহূর্ত্তও নহে। এই বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত এবং দশ কোটি বৎসর পূর্ব্বের মুহূর্ত্ত দুয়ের মধ্যে আমরা যতটা প্রভেদ মনে করি, তাহা আমাদের জ্ঞানের অপূর্ণতারই পরিচয় প্রদান করে, তা বই তাহা বাস্তবিক সত্যের পরিচয় প্রদান করে না। ইউক্লিডের জ্যামিতিক ভাষায় ভেদাঙ্কুর-গণিত differential calculus ব্যাখ্যা করিয়া বুঝানো যেমন সুদুষ্কর, তেমনি কালিক ভাষায় কালাতিগ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া বুঝানো সুদুষ্কর। কিন্তু তাহা বলিয়া আধ্যাত্মিক তত্ত্ব মনুষ্যের জ্ঞানের অগোচর নহে—মনুষ্য আধ্যাত্মিক তত্ত্ব একান্ত পক্ষেই বুঝিতে না পারে এমন নহে। তবে কি না, তাহা তলাইয়া বুঝিতে হইলে সাধনের নিতান্তই প্রয়োজন। সাধনের প্রণালী নূতন কোনো কিছু নহে, তাহা নানা শাস্ত্রে নানা রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে;—সমস্তের সমন্বয় দ্বারা আমি যাহা

প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা সংক্ষেপে এই :— সাধন সোপানের তিনটি পংক্তি বা ধাপ ; (১) বিবেক এবং বৈরাগ্য দ্বারা অহংকার এবং বিষয়াসক্তি মন হইতে নির্ধৃত করিয়া ফেলা সাধন সোপানের প্রথম পংক্তি। ইহা একরূপ আধ্যাত্মিক স্নান। ভৌতিক স্নান দ্বারা যেমন গাত্র-শুদ্ধি হয়, আধ্যাত্মিক স্নান-দ্বারা তেমনি চিত্ত-শুদ্ধি হয়। এইরূপ স্নানের অব্যবহিত ফল হয়—অন্তঃকরণে অহংকারের পরিবর্ত্তে দৈন্য, বিষয়াসক্তির পরিবর্ত্তে ঔদাসীন্য। তাহার পরে আপনার অপূর্ণতা উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরমাত্মার পূর্ণতা আত্মার অভ্যন্তরে প্রতীয়-মান হয়। কেননা পরমাত্মার পূর্ণতা আদর্শরূপে সাধকের অন্তঃকরণে নিহিত আছে বলিয়া তাহারই প্রতিযোগে সাধক আপনার অপূর্ণতা উপলব্ধি করে। আতপের প্রতিযোগেই ছায়া দৃষ্টি-গোচর হয় ; আর, বৃক্ষের তলস্থিত ছায়াই বলিয়া দেয় যে, বৃক্ষের মস্তকের উপরে সূর্য্যাতপ অধিষ্ঠান করিতেছে *। সাধকের বাসনাবর্জ্জিত অহংকারবর্জ্জিত দীন হীন এবং শূন্য হৃদয় আপনার অন্তরে পরিপূর্ণ আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মার সংস্পর্শ উপলব্ধি করিয়া পরমাত্মার দর্শন-লাভের জন্য ব্যাকুল হ'ন। তাহার পরে সাধুসঙ্গ এবং শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা হৃদয়াভ্যন্তরে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন।

(২) ধ্যানে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে করিতে ক্রমশই সাধকের ঈশ্বর-প্রীতি প্রবর্দ্ধিত হয় ;—প্রীতির পরিপক্ক অবস্থায় তাঁহার মুখ দিয়া এইরূপ কথা বাহির হয় যে,

"স এব প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।"

এই যে অন্তরতর পরমাত্মা ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, এবং আর আর সমস্ত বস্তু হইতে প্রিয়। পরমাত্মাতে সাধকের প্রীতি সম্বন্ধ ঘনীভূত হইলে, আর তাঁহার ঈশ্বরকে পর বলিয়া মনে হয় না—আপনা হইতেও আপনার বলিয়া মনে হয়।

(৩) সাধকের ঈশ্বর-প্রীতি প্রবর্দ্ধিত হইলে ঈশ্বরেতে তাঁহার আত্ম-সমর্পণের ইচ্ছা বলবতী হয়। তদনুসারে তিনি ঈশ্বরেতে আত্মসমর্পণ করিয়া ঈশ্বরের সম্পূর্ণ অধীন হইয়া যথা-কর্ত্তব্য সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। ঈশ্বরকে তিনি আপনা হইতেও আপনার মনে করেন ; এই জন্য ঈশ্বরের অধীনতাকে তিনি আপনারই অধীনতা মনে করেন—স্বাধীনতা মনে করেন। ঈশ্বর যদি তাঁহার 'পর' হইতেন তবেই তিনি ঈশ্বরের অধীনতাকে পরাধীনতা মনে করিতেন।

ঈশ্বরেতে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া আপনার ইচ্ছাকে তাঁহার অধীনে নিযুক্ত করার নামই অধ্যাত্মযোগ ; এইরূপ অধ্যাত্মযোগেই আত্মার স্বাধীনতা সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট হয়। এইরূপে (১) আধ্যাত্মিক স্নানানন্তর ব্রহ্ম-দর্শন করিয়া, (২) ঈশ্বরের প্রেমামৃত রস-পান করিয়া, (৩) অধ্যাত্ম-যোগে ঈশ্বরেতে আত্মসমর্পণ করিয়া ঈশ্বরাভিপ্রেত উত্তরোত্তর উন্নতি সোপানে আরোহণ করাই মনুষ্যের পরম-পুরুষার্থ। দার্শনিক মতামত বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, সাধক বিবেক

* All imperfect things must continually demonstrate the Perfect for the reason that they do not exist by reason of their defects but through what of truth there is in them ; and the imperfection is continually manifesting the want of the Perfect.

(একটি ইংরাজি দার্শনিক পত্রিকা-হইতে উদ্ধৃত)

দ্বারা দ্বৈতবাদ হইতে অদ্বৈতবাদে উপনীত হন এবং অধ্যাত্মযোগ দ্বারা অদ্বৈতবাদ হইতে দ্বৈতাদ্বৈতবাদে উপনীত হ'ন। সাধক যখন সাধনের প্রথম সোপান হইতে (বিবেক-সোপান হইতে) দ্বিতীয় সোপানে (যোগ-সোপানে) পদনিক্ষেপ করেন তখনই দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ উভয়ে পরস্পরের সংশ্লেষে সুসংস্কৃত এবং সুসংহত হইয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদে পরিণত হয়।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৮, শ্রাবণ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৬৭১ ৫৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৬৫৮৸৵০
সমষ্টি	...	১৩২৯৸৵৬
ব্যয়	...	৬৯৮।৶৬
স্থিত	...	৬৩১৶০

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত	
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন	
এক কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲
হাওলাত শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু	৭৲
সমাজের ক্যাশে মজুত	১২৪৶০
	৬৩১ ৶০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	২১০৲
মাসিক দান।	
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২০০৲
সাম্বৎসরিক দান।	
শ্রীযুক্ত বাবু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
	২১০৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩২৸৵৬
শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর,	কলিকাতা	৯৲
„ „ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,	ঐ	৯৲
„ „ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর,	ঐ	৩৲
„ „ গোপালচন্দ্র সুর,	ঐ	৩৲
„ „ কুঞ্জবিহারী দেব,	ঐ	১৸০
„ „ শরচ্চন্দ্র চৌধুরী,	চুঁচুড়া	৩৲
„ „ শ্যামলাল মিত্র,	লক্ষ্ণৌ	৩৵০
„ „ শশীভূষণ তালুকদার,	টাঙ্গাইল	৸৶
		৩২৸৵৬
পুস্তকালয়	...	১২৸০
যন্ত্রালয়	... ...	৪১৪৲
গচ্ছিত	... ...	।৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		১৸০
সমষ্টি		৬৭১ ৫৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৩৪৭৸৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৪৬৸৶৬
পুস্তকালয়	...	৪০৸৶৯
যন্ত্রালয়	...	২৬৩৶৩
সমষ্টি	...	৬৯৮।৶৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২৬শে আশ্বিন সোমবার কালনা ব্রাহ্মসমাজের ত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রাতে ও সায়াহ্নে ব্রহ্মোপাসনা ও সঙ্গীত হইবে। ভক্তবৃন্দ যথা সময়ে উপস্থিত হইয়া সুখী করিবেন।

শ্রীবিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দ্দশ কল্প।

তৃতীয় ভাগ।

কার্ত্তিক ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৮।

৬৫১ সংখ্যা ১৮১৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বৈদান্তিক মত।*

আজকাল নবীনতর বেদান্তীগণ না বুঝিয়া বেদান্তের কপোলকল্পিত অর্থ করিয়া জগতের হানি করিতেছেন, মনুষ্যগণকে অভিমানাদি দোষে প্রবৃত্ত করাইয়া দুঃখসাগরে নিমজ্জিত করিতেছেন এবং অল্পজ্ঞানী লোকেরাও এই মতে দীক্ষিত হইয়া অধর্ম্ম, অনৈশ্বর্য্য পরাধীনতারূপ কালপাশে বদ্ধ হইতেছেন। (১) তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া মানেন, (২) কেহ বা নিজে পাপানুষ্ঠান করিয়া বলেন আমি অকর্ত্তা অভোক্তা (৩) কেহবা বলেন জগৎ মিথ্যা ইহা কল্পিতমাত্র (৪) কেহ বা মোক্ষ অর্থে জীবের লয় বুঝেন। এই চারি সম্প্রদায়ের মতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনই বর্ত্তমান প্রস্তাবের লক্ষ্য।

১। যাঁহারা বলেন জীবই ব্রহ্ম তাঁ- … বলিয়া থাকেন "প্রজ্ঞা- … ইহাও বলেন যে এই … কিন্তু সমগ্র ঋক্-

* … বেদান্তসিদ্ধান্ত নিবারণম্" …

বেদের আট অষ্টকের ভিতরে এ কথা কোথাও নাই। বেদের ব্যাখ্যান যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ তাহাতে এইটুকু মাত্র আছে, যে "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম"। অর্থাৎ "প্রকৃষ্টং জ্ঞানং যস্মিন্ তৎ প্রজ্ঞানং প্রকৃষ্টজ্ঞানস্বরূপং" যাঁহাতে প্রকৃষ্ট সর্ব্বোত্তম অনন্ত জ্ঞান আছে তিনিই প্রজ্ঞান; অর্থাৎ এই বিশেষণে ইহাই নিশ্চিত হইতেছে যে অবিদ্যান্ধকার বা অজ্ঞানের লেশমাত্র তাঁহাতে নাই, ছিল না, ও তাঁহাতে থাকিতে পারে না। তিনি সকল অপেক্ষা বৃদ্ধ, সকলের শ্রেষ্ঠ, ভক্তগণের একমাত্র মোক্ষসুখ ও অনন্তানন্দদাতা; ইহাই পরমাত্মার স্বরূপ। কিন্তু নবীন বৈদান্তিকগণ ঐ শ্রুতিটীকে মহাবাক্য কহেন। ফলত কোন ঋষি-প্রণীত গ্রন্থে ইহা মহাবাক্যরূপে উক্ত হয় নাই।

"অহং ব্রহ্মাস্মি" বৈদান্তিকগণ ইহার এরূপ অর্থ করেন যে আমি ব্রহ্ম, ভ্রান্তিবশত জীব হইয়াছিলাম, এক্ষণে জানিতে পারিয়াছি যে আমিই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। ফলতঃ পূর্ব্বাপর গ্রন্থের সহিত এই বাক্যের সম্বন্ধ লক্ষ্য না করিবার দো-

যেই যত গণ্ডগোল ঘটিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ইহার অর্থ অন্যরূপ। শতপথ ব্রাহ্মণ, কাণ্ড ১৪, প্রপাঠক, ৩ কণ্ডিকা ৮ তে আছে

"আত্মেত্যেবোপাসীত। অন্তত্র হ্যেতে সর্ব্বংএকী ভবন্তীত্যুপক্রম্য তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা সযোঽন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যতীশ্বরোহ তথৈব স্যাদাত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি।"

ইহার ফলিতার্থ এই "অততি সর্ব্বত্র ব্যাপ্নোতীতি আত্মা পরমেশ্বরঃ" যিনি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন তিনিই আত্মা পরমেশ্বর। সকল জীবের পক্ষে তাঁহাকে উপাসনা করা চাই এবং তাঁহাকেই সকল অপেক্ষা প্রিয়রূপে ধারণা করা চাই। তিনি পুত্রবিত্তাদি অপেক্ষা প্রিয়তম, অন্তরতর আত্মারও অন্তর্যামী। সকলের আত্মা স্বরূপ এই পরমাত্মাকে প্রিয় না জানিয়া যিনি অপরকে প্রিয় কহেন তিনি দুঃখসাগরে নিপতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন।

আত্মানমের প্রিয়মুপাসীত স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি।

আর যিনি সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বশক্তিমান ন্যায়কারী নিরাকার অজ পরমাত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করেন তিনিই কেবল ইহলোক পরলোকে ও মোক্ষাবস্থায় সর্ব্বানন্দ প্রাপ্ত হয়েন। এবং ঈশ্বরকৃপায় ঈশ্বরোহ তথৈব স্যাৎ তাবৎ মনুষ্যের মধ্যে পরমৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া সমর্থ-সত্ত্বাবান হয়েন। ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি, পরব্রহ্মের উপাসকের আনন্দ কিছুতেই নষ্ট হয় না। তিনি সর্ব্বদা স্থিরসুখ উপভোগ করেন। অত্র হ্যেতে সর্ব্বএকী ভবন্তি, ব্রহ্মজ্ঞানবলে সকলের প্রতি প্রীতিমান হইয়া যেমন নিজের তেমনি পরেরও সুখ দুঃখ তুল্যভাবে তিনি অনুভব করিতে থাকেন; এবং মনুষ্য মাত্রেরই সুখে একীভূত হইয়া তিনি সকলের মধ্যে একইরূপ সুখ বিস্তার করিবার প্রয়াসী হয়েন। তিনি সকলকে তুল্য দৃষ্টিতে দেখেন। ব্রহ্মবিৎ বলেন যে সেই এক পরমেশ্বরের সামর্থ্যবলে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, একমাত্র তিনিই জগৎ সৃষ্টির মূলে বিদ্যমান ছিলেন, "তৎ ব্রহ্মাবেৎ" তিনিই সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত থাকিয়া ইহাকে রক্ষা করিতেছেন। যিনি ঘোর অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া ব্রহ্মবিদ্যার আলোক প্রাপ্ত হয়েন, তিনিই ব্রহ্মের নিত্যসুখ লাভ করেন। যিনি বিজ্ঞানবলে সমাধিযোগে ঈশ্বরকে এইরূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম "য এবং বেদ" তাঁহারই ধারণা হইবে "অহং ব্রহ্মাস্মীতি" "আমি ব্রহ্ম" অর্থাৎ আমি ব্রহ্মস্থ। ব্রহ্ম আমার অন্তরে বাহিরে বিরাজ করিতেছেন, আমিই তাঁহারই নিত্যসুখ ভোগের অধিকারী। যেমন আকাশ হইতে গৃহ ভিন্ন নহে, গৃহ হইতে আকাশ ও ভিন্ন নহে, অথচ আকাশ ও গৃহ এক নহে, কিন্তু পরস্পর পৃথক, তেমনি জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে ব্যাপ্য ও ব্যাপক সম্বন্ধ বর্ত্তমান, তাঁহারা একভাবে ভিন্ন আর একভাবে অভিন্ন। বৃহদারণ্যকে ৬ষ্ঠ প্রপাঠকে আছে

"য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরো যময়তি স ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।"

যে পরমাত্মা তোমার [illegible]
পাস্য অমৃত পুরুষ, [illegible]
সঙ্গে রহিয়াছেন [illegible]
পৃথক, যাঁহাকে তুমি [illegible]
মার শরীর, যিনি [illegible]

করিতেছেন, যিনি তোমার নিয়ন্তা, সেই অন্তর্য্যামী বিধাতা পুরুষকে ছাড়িয়া অন্য কাহারও উপাসনা করিও না। লোকে ইহা অবধারণ করিতে না পারিয়া অভিমান বশে বলিয়া থাকে যে আমিই ঈশ্বর, ঈশ্বরের আবার উপাসনা কি। এইরূপে লোকে সম্যক বিচার না করিয়া বেদান্তের দুই চারি অক্ষর শিখিয়া যাহা মনে করে তাহাই বলিতে সাহসী হয়।

"তত্ত্বমসি" যাহা বৈদান্তিকগণের নিকট মহামূল্য সামগ্রী তাহাও সামবেদের বচন নহে, কিন্তু সামব্রাহ্মণান্তর্গত ছান্দোগ্য উপনিষদের কথা। পূর্ব্বাপর প্রকরণ ছাড়িয়া দিয়া নবীন বৈদান্তিকগণ ইহার অর্থ বিকৃত করিয়া মহান অনর্থ ঘটাইয়াছেন। মূলে এই আছে

"সযঃ এষোণিমৈ তদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি।"

উদ্দালক আপন পুত্র শ্বেতকেতুকে উপদেশ করিতেছেন সেই পূর্ব্বোক্ত পরমাত্মা যিনি সমস্ত জগতের আত্মা তিনি কিরূপ, না তিনি "অণিমা" অত্যন্ত সূক্ষ্ম। অর্থাৎ প্রকৃতি আকাশ জীবাত্মা হইতেও সূক্ষ্ম; তিনি সত্যস্বরূপ। হে শ্বেতকেতু! তিনি সকল জগতের অন্তর্য্যামী আধারভূত, নির্ব্বিকার, অবিনশ্বর; "স আত্মা" তিনি সকলের আত্মা; তাঁহা অপেক্ষা সকলের অন্তরতম আর কেহই নহেন। হে শ্বেতকেতু! যিনি সকলের আত্মা তিনি তোমারও অন্তর্য্যামী।

"তদন্তর্যামী তদধিষ্ঠানস্তদাত্মকস্ত্বমসীতি ফলিতার্থঃ"

তত্ত্বমসি অর্থে তৎসহচারণ বা তৎসহচার উপাধিই বুঝায়।

"যষ্টিকাং ভোজয় অর্থাৎ যষ্টিকয়া সহচরিতং ব্রাহ্মণং ভোজয়েতি গম্যতে, তথৈব তৎব্রহ্মসহচরিতস্ত্বমসীত্যবগন্তব্যং তথা অহং ব্রহ্মাস্মীত্যত্রাহং ব্রহ্মসহচরিতো বা ব্রহ্মস্থোস্মীতিবিজ্ঞেয়োঽর্থঃ তাৎস্থ্যোপাধিনা, যথা মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীত্যত্র মঞ্চস্থাঃ ক্রোশন্তীতি বিজ্ঞায়তে এবং যত্রযত্রাসংভব আগচ্ছেত্তত্র তত্রোপাধিনোঽর্থো বেদিতব্যঃ (অত্র ন্যায়দর্শনস্য দ্বিতীয়াধ্যায়স্থং চতুষষ্টিতমং সূত্রং প্রমাণমস্তি) সহচরণস্থানতাদর্থ্যবৃত্তমানধারণসামীপ্যযোগসাধনাধিপত্যেভ্যোব্রাহ্মণমঞ্চকটরাজশক্তু চন্দনগঙ্গাশাটকান্নপুরুষেষ্বতদ্ভাবেপি তদুপচারঃ। এষু দশবিধাসংভবেষু বাক্যার্থেষু দশোপাধয়ো ভবন্তীতিবেদ্যম্।"

অর্থাৎ "যষ্টিককে ভোজন করাও অর্থে যষ্টিসহচারী ব্রাহ্মণকে ভোজন করাও বুঝিতে হইবে; "তৎত্বমসি" অর্থে তোমার সহচারী ব্রহ্মকে বুঝিতে হইবে। "অহং ব্রহ্মাস্মি" অর্থে আমি ব্রহ্মসহচারী বা ব্রহ্মস্থ বুঝিতে হইবে। ন্যায়ের ও অলঙ্কারের তাৎপর্য্যই এই। যথা—"মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি" ইহার অর্থ মঞ্চস্থ (মাচাস্থিত) লোকেরা ক্রন্দন করিতেছে বুঝিতে হইবে, মাচা কাঁদিতেছে এইরূপে বুঝিলে চলিবে না। এইরূপে যেখানে যেখানে অসম্ভব অর্থ প্রতীয়মান হইবে সেইখানে তাহার উপাধিগত অর্থ বুঝিতে হইবে। ন্যায়দর্শনের ২য় অধ্যায়ের ৬৪ তম সূত্রে এইরূপ বিধি আছে। প্রকৃত পক্ষে সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব ভ্রান্ত্যাদিদোষরহিতত্ব প্রভৃতি বিশেষণ ব্রহ্মব্যতীত জীবে সম্ভবিতে পারে না।

"অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইহাকে অনেকে অথর্ব্ববেদের বাক্য কহেন। কিন্তু ইহা অথর্ব্ববেদের বাক্যই নহে। কিন্তু মাণ্ডুক্য উপনিষদের কথা। ইহার সরল তাৎপর্য্য এই যে বিচারশীল পুরুষ আপনার অন্তর্যামীকে প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতেছেন যে যিনি আমার অন্তর্যামী আমার উপাস্য দেবতা তিনিই ব্রহ্ম।

যোসাবাদিত্যে পুরুষঃসোঽসাবহম্। ইহা যজুর্ব্বেদের ৪০ অধ্যায়ের কথা।

ইহার অর্থ এই যে যিনি আদিত্যে অর্থাৎ যিনি আমার প্রাণে তিনি আমার জীবাত্মা। শতপথ ব্রাহ্মণের মতে আদিত্যো বৈ প্রাণঃ অর্থাৎ আদিত্য শব্দ প্রাণকে বুঝায়। "আদিত্যো হবৈ প্রাণোরয়িরেব চন্দ্রমা" মুণ্ডকোপনিষদ। যিনি প্রাণের পূর্ণপ্রাণ প্রাণের প্রেরক তিনি আমার আত্মার মধ্যে রহিয়াছেন।

যদ্বা পরমেশ্বরোভিবদতি হে জীবাঃ যঃ অসৌ আদিত্যে বাহ্যে সূর্য্যে কিং বা অন্তর্গতে প্রাণে স অসৌ অহমেবাস্মীতি মা বিত্ত।

তিনি অন্তরে বাহিরে সূর্য্যাদি স্থূল জগতে আকাশাদি সূক্ষ্ম জগতের মধ্যে বিরাজমান, আমিও যাঁহাদ্বারা পরিপূর্ণ, তাঁহারই এখানে প্রার্থনা হইতেছে। ইহার পূর্ব্ব শ্লোকে আছে অগ্নে নয় ইত্যাদি।

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম (ছান্দোগ্য উপনিষদ) এখানেও তাৎস্থ্যোপাধি বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বোদ্ধৃত ন্যায়ের সূত্রানুসারে ইদং সর্ব্বং জগৎ ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মস্থং, যদ্বা ইদং যজ্জগদাধিষ্ঠানং তৎসর্ব্বং ব্রহ্মৈব নাত্র কিঞ্চিৎ বস্ত্বন্তরং মিলিতমিতি বিজ্ঞেয়ম, যথেদং সর্ব্বংঘৃতমেব নেদং তৈলাদিভির্মিশ্রিতমিতি।

অর্থাৎ ইহা সমুদয়ই ব্রহ্ম অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্মস্থ, কেবল মাত্র ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত, অন্য কিছুতে নহে। যেমন সর্ব্বং ঘৃতং বলিলে নিরবচ্ছিন্ন ঘৃতময় আদৌ তৈলাদি মিশ্রিত নহে বুঝায়, তেমনি সর্ব্বং ব্রহ্ম বলিলে একমাত্র ব্রহ্মেরই অধিষ্ঠানতা বুঝায়, অপর কাহারও সম্বন্ধ নাই, ইহাই অনুসূচিত হয়।

২। এই শরীরের কর্ত্তা ও ভোক্তা এক জীব অর্থাৎ জীবাত্মা। মনুষ্যদেহের সমস্তই এই জীবের অধীন। ফলত পাপপুণ্যের কর্ত্তা এই জীব ভিন্ন আর কেহই নহেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ব্যাসসূত্র ও বেদাদি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই—শ্রোত্রেণ শৃণোতি, চক্ষুষা পশ্যতি, বুদ্ধ্যা নিশ্চিনোতি মনসা স কল্পয়তি অর্থাৎ এই জীবাত্মা শ্রোত্রের দ্বারাই শ্রবণ করে, চক্ষু দ্বারা দর্শন করে, বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চয় করে মন দ্বারা কল্পনা করে। যেমন অসিনা চ্ছিনত্তি শিরঃ, অসি দ্বারা শিরশ্ছেদন করিতেছে বলিলে ছেদনের কর্ত্তা মনুষ্য, সাধন তরবারি, শির ছেদনের কর্ম্ম হয় এবং তজ্জনিত পাপ ও শাস্তি ছেদনের কর্ত্তাকে অর্শায়, তরবারে অর্শায় না, তেমনি শ্রোত্রাদি জনিত পাপ পুণ্যের কর্ত্তা ও ভোক্তা জীব, তদতিরিক্ত অন্য কেহ নহেন। গৌতম মুনি ও ব্যাসাদিও এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন—ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নসুখদুঃখজ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গমিতি। ইচ্ছা দ্বেষ প্রযত্ন সুখ দুঃখ জ্ঞান আত্মারই লিঙ্গ। "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি" অন্য (জীবাত্মা) সুখে ফলভোগ করেন, ইহা হইতে সিদ্ধান্ত হইতেছে জীবই যে পাপপুণ্যের কর্ত্তা এবং সুখদুঃখের ভোক্তা ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। লোকে বিষয়ভোগ তৃপ্তির জন্য বলিয়া থাকেন জীব অকর্ত্তা অভোক্তা; পাপপুণ্য আবার কি।

৩। অনেকে বলেন জগৎ মিথ্যা কল্পিত, কিন্তু এরূপ বিশ্বাস অবিদ্যান্ধকারের মাহাত্ম্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—

সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ।

অর্থাৎ যাহার মূল সত্য তাহার বৃক্ষ কিরূপে মিথ্যা হইবে? যে পরমেশ্বরের সামর্থ্য এই জগতের কারণ, তিনি নিত্য। কেন না পরমাত্মা নিত্য হইলে তবে তাঁহার সামর্থ্য নিত্য হইতে পারে। তাঁহা হইতে যখন জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তখন তাহা মিথ্যা হইবে কিরূপে। "আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেপি তৎতথা" আদি ও অন্তে যাহার বিদ্যমানতা নাই, বর্ত্তমানে

তাহা কি প্রকারে থাকিতে পারে, যদি কেহ এরূপ যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন তাহার উত্তর এই যে ঈশ্বরের সামর্থ্যরূপে জগৎ পূর্ব্বে (অব্যক্ত ভাবে) ছিল, এখনও আছে, পরেও (প্রলয়াবস্থায় অব্যক্ত ভাবে ঈশ্বরেই) থাকিবে। যদি কেহ বলেন যে সংযোগজন্য পদার্থ (পরমাণুর সমষ্টিজাত বলিয়া) সংযোগের পূর্ব্বে বা বিয়োগের পরে (প্রলয়ান্তে) কিরূপে থাকিতে পারে। তাহার উত্তর এই যে বিদ্যমান সংপদার্থেরই সংযোগ হইতে পারে, যাহার বিদ্যমানতা নাই তাহাদের আবার সংযোগ কি। যাহার বিদ্যমানতা আছে, তাহার পরমাণু সকল বিযুক্ত হইয়া গেলেও অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থ রহিয়া যায়। ঈশ্বরের সামর্থ্যই জগতের কারণ, এবং উহা নিত্য, ঈশ্বরের ঐ চিরন্তন স্বাভাবিক শক্তিগুণেই জগৎ রচিত হইতেছে, তিষ্ঠিতেছে, এবং প্রলয় দশা প্রাপ্ত হইতেছে।

(৪) অনেকে বলেন জলবিন্দু যেমন সমুদ্রবারিতে মিশাইয়া যায়, লয়ও তেমনি, কিন্তু ইহা লয়ের প্রকৃত তাৎপর্য্য নহে।

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টেত তমাহুঃ পরমাং গতিং।

অর্থাৎ জীবের মোক্ষের অবস্থায় পাঁচ ইন্দ্রিয়জ্ঞান (বৃত্তি) মনের সহিত অর্থাৎ বিজ্ঞানের সহিত স্থির হইয়া দাঁড়ায়, বুদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মক বৃত্তি আর চেষ্টা করে না, শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ জীবাত্মা পরমানন্দ স্বরূপে যুক্ত হইয়া সর্ব্বদা আনন্দ অনুভব করিতে থাকে। ইহাকেই পরম গতি বা মোক্ষ কহে।

পরমজ্যোতিরূপং সংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিস্পদ্যতে ইতি শ্রুতি বৃহদারণ্যকস্য।

অর্থ, পরম জ্যোতি যে পরমাত্মা তাঁহার অত্যন্ত সমীপতা প্রাপ্ত হইয়া, (স্বেন রূপেণ) অর্থাৎ অবিদ্যাদি দোষ হইতে পৃথক হইয়া পরিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ স্বসামর্থ্য সম্পন্ন জীব মুক্ত হইয়া যায়। শারীরিক সূত্রের চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থপাদেও মুক্তির তাৎপর্য্য ঐরূপ নিরূপিত হইতেছে।

অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবম্।

অর্থাৎ বাদরির মতে মোক্ষাবস্থায় ইন্দ্রিয় বা শরীরাদি জীবের সহিত থাকে না। কিন্তু মন থাকে।

ভাবং জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ।

কিন্তু জৈমিনি আচার্য্য কহেন মুক্তাবস্থায় দেহ থাকে ও মুক্ত ব্যক্তি নিরতিশয় আনন্দ ভোগ করিতে থাকেন।

বাদরায়ণ অর্থাৎ ব্যাসের মত এই যে

দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ।

বাদরায়ণ, বাদরি ও জৈমিনির মত সমন্বয় করিয়া কহিতেছেন যে (মৃতাশৌচান্ত দ্বাদশাহ শব্দের ন্যায়) মুক্তাবস্থায় ভাব ও অভাব দুইই থাকে, অর্থাৎ স্থূলশরীর ও অবিদ্যাদি ক্লেশের অত্যন্ত অভাব, এবং জ্ঞান ও আত্মার পরিশুদ্ধ স্বশক্তির ভাব ইহাই মোক্ষ। অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাকে লাভ করিলে জীব একদিকে জন্ম মরণাদি দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়, অন্যদিকে নিরতিশয় আনন্দে নিমগ্ন থাকে, ইহাই মোক্ষ।

গৌতম ঋষিরও এই মত। তিনিও স্বীয় ন্যায়দর্শনে লিখিয়াছেন,

দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ। ২। বাধনালক্ষণং দুঃখম্। ২১। তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ। ২২।

অর্থ। মিথ্যাজ্ঞানপ্রযুক্ত জড়ে চেতনবুদ্ধি, ও চেতনে জড়বুদ্ধি হয়। ঐ মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তি পাইলে, জীবের অবিদ্যাদি দোষ তিরোহিত হইয়া যায়। তাহা হইতে বিষয়াসক্তি নষ্ট হয়। বিষয়াসক্তি অর্থাৎ

প্রবৃত্তি বিনষ্ট হইলে আর জন্ম হয় না। জন্ম ছুটিয়া গেলে দুঃখও ছুটিয়া যায়। সর্ব্ববিধ দুঃখ ছুটিয়া গেলে জীব অপবর্গ বা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন। বাধনা অর্থাৎ বিবিধ প্রকার পীড়া বা কষ্ট উহার অত্যন্ত নিবৃত্তি হইলে জীব মুক্তিলাভ করেন। এইরূপে আরও অনেক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে যে মোক্ষ অর্থে জীবের লয় নহে, কিন্তু জীবের অত্যন্ত আনন্দভোগের অবস্থা।

সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্বচনম্।

অর্থ যিনি সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মকে আত্মস্থ করিয়া জানেন বা প্রাপ্ত হয়েন, তিনি সর্ব্বগত ও সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের সহিত সমুদায় কামনার বিষয় উপভোগ করেন অর্থাৎ সকল দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া ঈশ্বরের সহিত সদানন্দে অবস্থিতি করেন। যাঁহারা মোক্ষ অর্থে জীবের লয় বুঝেন, তাঁহাদের মতে বিবেকাদি সাধন নিতান্তই নিষ্ফল। লয়ে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য ধরিলে ব্রহ্মও একভাবে ভ্রান্ত ও অজ্ঞানী হইয়া পড়েন। কিন্তু তাহা কিরূপে হইবে—ব্রহ্ম যিনি তিনি "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং কবিরিত্যাদি" পরিশুদ্ধ পাপরহিত সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহাতে অজ্ঞানাদি দোষ কখনই আসিতে পারে না; তিনি দেশ কালের অপরিচ্ছেদ্য। ভ্রান্ত্যাদি দোষ অল্পজ্ঞ জীবে তাঁহাতে নহে। যদি কেহ বলেন—

"তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ অনেনাত্মনা জীবেনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি।" তৈত্তিরীয়োপনিষদ্।

অর্থ। ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়া ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, এবং জীবাত্মারূপে শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নামরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। তাহার উত্তর এই যে এরূপ অর্থ নিতান্তই অনর্থকর।

শরীরং প্রবিষ্টো জীবঃ জীবমনুপ্রবিষ্ট ঈশ্বরোস্তীতি গম্যতে।

জীব শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, এবং ঈশ্বর জীবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য। শ্রুতি প্রমাণ এই যে

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।

এক শরীর মধ্যে জীবাত্মা আর পরমাত্মা রহিয়াছেন, তাঁহারা পক্ষীর ন্যায় একই বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। ইহার উপর যদি কেহ বলেন যে জীব ও ঈশ্বর একই, তিনি নিতান্তই অর্ব্বাচীন। ঈশ্বর আপনার সামর্থ্যবলে জগৎ উৎপন্ন করিয়াছেন। প্রমাণ—

তমস্যপারে রজসো ব্যোমনঃ স্বভূত্যোজা অবসে ধৃষন্মনঃ। চকৃষে ভূমিং প্রতিমানমোজসোঽপঃস্বঃ পরিভূরেষ্যা দিবম্। ঋগ্বেদ সংহিতা অঃ ১, অ ৪, ব ১৩ ম ১২।

হে পরমেশ্বর। তুমি আপনার "স্বভূত্যা" সামর্থ্য ও "ওজস" পরাক্রমে ভূমি জল, স্বর্গ দিব অর্থাৎ ভূমি হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ সৃষ্টি রক্ষা ও প্রলয় করিতেছ।

ন যস্য দ্যাবাপৃথিবী অনুব্যচো ন সিন্ধবো রজসো অন্তমানশুঃ নোত স্ব বৃষ্টিং মদে যস্য যুধ্যতএকো অন্যচ্চকৃষে বিশ্বমানুষক্। ঋক সং, অ ১, অ ৪, বঃ ১৪, মন্ত্র ১৪।

হে পরমেশ্বর! এক অসহায় বিশ্ব তোমারই অনুসঙ্গী, ইহা তোমারই রচনা, তুমিই ইহার অবলম্বন! কিন্তু ইহা তোমা হইতে স্বতন্ত্র, ইহা তোমার স্বরূপভূত নহে।

অন্যদ্বিশ্বং স্বস্মাদ্ভিন্নং ত্বং চকৃষে কৃতবানসি।

এই জগৎ তোমার স্বরূপ হইতে অন্যৎ ভিন্ন, তুমি ইহার রচয়িতা, কিন্তু তুমি জগৎরূপ নহ।

"অণোরণীয়ান্মহতোমহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্ তমক্রতুং পশ্যতি বীতাশোকো ধাতুঃ প্রসাদাত্ম-হিমানমাত্মনঃ। নিত্যো২নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামে-কোবহূনাং যো বিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যে২নু-পশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং।

যিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম মহৎ হইতে মহৎ, যিনি জীবদিগের আত্মাতে নিহিত বা স্থিত, অর্থাৎ যাঁহাকে সাধকেরা ধ্যানপ্রভাবে আত্মার মধ্যে দেখিতে পান ইত্যাদি। ইহাতে জীব ও ব্রহ্মের ব্যাপ্য ব্যাপক অন্তর্যামী অন্তর্যাম্য সম্বন্ধই নিরূপিত হই-তেছে; এবং জীব ও ব্রহ্ম যে এক নহেন তাহাই ভূয়োভূয় বলা হইতেছে। ব্যাস-সূত্রে আছে "নেতরো২নুপপত্তেঃ" ইতর-জীব জগতের স্রষ্টা বা কারণ হইতে পারে না। "ভেদব্যপদেশাচ্চ" ব্রহ্ম ও জীব উভয়ে ভিন্ন। "মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ" মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের সমীপবর্ত্তী হইয়া আনন্দী হয়েন। "প্রাণভৃচ্চ" প্রাণধারী জীব জগ-তের কারণ নহেন। "বিশেষণভেদব্যপ-দেশাভ্যাং নেতরৌ" বিশেষণ দিব্য সর্ব্ব-জ্ঞাদি ইহাই ভেদব্যপদেশ; জীব ও প্রকৃ-ত্যাদি হইতে পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ এ কারণ জীব ও প্রকৃতি জগতের কারণ নহেন। এই-রূপে ব্যাসের শারীরক সূত্রেরও স্পষ্ট সিদ্ধান্ত যে জীব ও ব্রহ্ম এক নহেন। কিন্তু নবীন বেদান্তীগণ প্রথমতঃ জগৎকে মিথ্যা কহিয়া ও দ্বিতীয়ত জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য স্বীকার করিয়া সাধারণের বড়ই অনিষ্ট করিতেছেন। তাঁহাদের মতানু-যায়ী হইলে জগতের উন্নতি, পরস্পরের প্রতি প্রীতি, বিদ্যাদি শিক্ষায় পুরুষার্থলাভ ও শ্রদ্ধাদি সমুদায় নিস্ফল হইয়া পড়ে। পরমেশ্বরের আজ্ঞাপালন স্তুতি প্রার্থনা উপাসনা ও আত্মপ্রসাদের পরিবর্ত্তে মিথ্যা-ভিমান স্বার্থসাধন দুষ্ক্রিয়াশক্তি পাপে প্রবৃত্তি বিষয়ভোগ জগতের মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ অর্থহীন হইয়া পড়ে। অতএব সকলের কর্ত্তব্য যে শাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থ অবগত হইয়া, বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য নিরূপণ করিয়া তাহাই যেন জগতে প্রচার করেন, এবং ভ্রমপ্রমাদ ও মোহের হস্ত হইতে ইতরজনসাধারণকে রক্ষা করেন।

উপদেশ।

মনুষ্যের যতগুলি রিপু আছে তন্মধ্যে ঈর্ষা একটী প্রবল রিপু। পরের সুখ সৌ-ভাগ্য-দর্শনে মর্ম্মাহত হওয়ারই নাম ঈর্ষা বা পরশ্রীকাতরতা। যে ব্যক্তি পরের কোনরূপ শুভ-সন্দর্শন বা শুভ-সমাচার শ্রবণ করিয়া মর্ম্মাহত হয়, তাহার ক্ষণকালের জন্যও সুখ-শান্তি-সম্ভোগ ভাগ্যে ঘটে না। শাস্ত্র বলেন,—

"য ঈর্ষুঃ পরবিত্তেষু রূপে বীর্য্যে কুলান্বয়ে।
সুখসৌভাগ্যসৎকারে তস্য ব্যাধিরনন্তকঃ॥"

অন্যের ধনে, রূপে, বীর্য্যে, কুলে, সুখে, সৌভাগ্যে ও সদনুষ্ঠানে যে ঈর্ষা করে, তাহার ব্যাধির অন্ত নাই। পরশ্রীকাতরতা অশেষ আধ্যাত্মিক মহাব্যাধির আকর। নির্য্যাতন-স্পৃহা, মিথ্যা, শঠতা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তি-রাশি ঈর্ষার নিত্য সহ-চরী। ইহার প্রভাবে সময়ে সময়ে 'ক্রোধঃ সুদুর্জ্জয়ঃ শত্রুঃ' দুর্জ্জয় শত্রু ক্রোধের উৎ-পত্তি। ঈর্ষা ক্রমশঃ অন্যান্য রিপুকে উত্তেজিত করিয়া তোলে। একদিকে ঈর্ষার প্রভাবে যেমন প্রায় সমস্ত দুষ্প্রবৃত্তি সমুত্তেজিত হয়, সমস্ত অন্তঃশত্রু প্রশ্রয় পায়,—অপরদিকে তাহাদিগের অত্যাচারে মনুষ্যের সদ্গুণ ও সৎপ্রবৃত্তি সমূহ নিষ্পন্দ—নিস্তব্ধ—মৃত প্রায় হইয়াপড়ে।